ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর

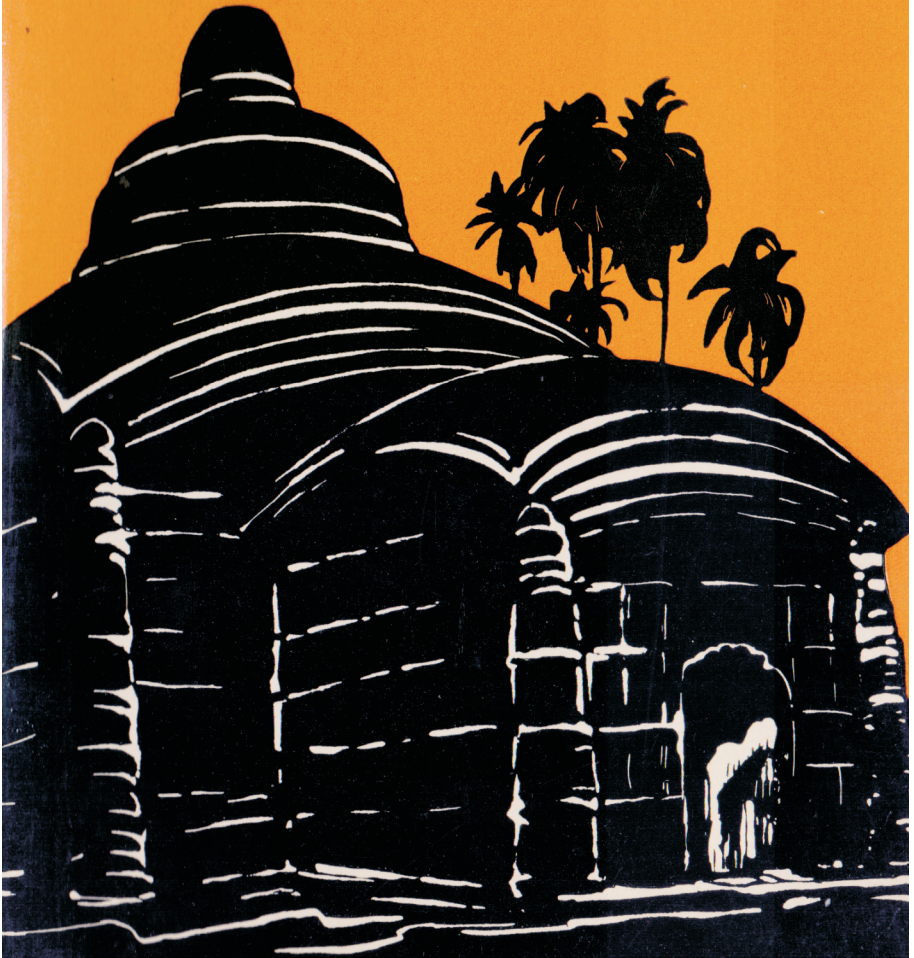

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী

ত্রিপুর-রাজধানী উদয়পুর

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী

DIRECTORATE OF RESEARCH
DEPARTMENT OF WELFARE FOR SCH. TRIBES
GOVERNMENT OF TRIPURA

TRIPUR–RAJDHANI UDAIPUR

1st Edition, March 1992.

Copy Right Reserved by the Directorate of Research
Government of Tripura.

Published by :
The Directorate of Research
Government of Tripura

Designed and Printed by :
Imprint Off-set Press
Dainik Sambad Bhavan
Agartala – Tripura

সূচনা

প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের গৌরবময় অধ্যায়ে উদয়পুর ছিল ত্রিপুরার রাজধানী। রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রচীন রাজধানীর গরিমা সর্বজন স্বীকৃত। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে উদয়পুরের মঠ - মন্দির, মসজিদ এবং ভগ্ন প্রাসাদ ও দীঘি পুষ্করিণীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। আমাদের গবেষণা বিভাগে ঐসব ঐ-তিহাসিক সূত্র সমূহের কোন প্রামাণ্য নথিপত্র নেই। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী নিজ প্রচেষ্টাতে প্রাচীন রাজধানীর ইতিহাস " ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর " রচনা করেন এবং গবেষণা অধিকারে পর্যালোচনাক্রমে ইহা প্রকাশিত হয়। তাঁর এই কাজ ভবিষ্যৎ গবেষকদের আরও বিস্তারিত গবেষণাতে আকর্ষণ করবে আশা করি।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে, বিলম্বে হলেও অবশেষে এই কাজ প্রকাশ করতে পারছি, সেজন্য আমার সহকর্মীদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আগরতলা, ৩১শে মার্চ
১৯৯২ ইং

লোকেশ চন্দ্র দাশ
অধিকর্তা,
গবেষণা অধিকার,
ত্রিপুরা সরকার।

সূচীপত্র

মুখ বন্ধ
ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় :
রাঙামাটি হল উদয়পুর ... ১

দ্বিতীয় অধ্যায় :
রাজধানীর অধিবাসী ... ৪

তৃতীয় অধ্যায় :
উদয় নগরী ... ৮

চতুর্থ অধ্যায় :
ত্রিপুরার রাজবাড়ী ... ১৩

পঞ্চম অধ্যায় :
রাজধানীর অর্থনৈতিক অবস্থা ... ১৭

ষষ্ঠ অধ্যায় :
রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ... ১৯

সপ্তম অধ্যায় :
রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ... ২৪

অষ্টম অধ্যায় :
লুণ্ঠিত রাজধানী ... ৩০

নবম অধ্যায় :
রাজধানীর উৎসব অনুষ্ঠান ... ৩৫

দশম অধ্যায় :
ইতিহাসের সাক্ষী ... ৪৭

একাদশ অধ্যায় :
নাগরিকদের সাধারণ স্বাস্থ্য ... ৬৯

দ্বাদশ অধ্যায় :
দীঘিময় উদয়পুর ... ৭১

পরিশিষ্ট
গ্রন্থ পঞ্জী ... ৭৮
নির্ঘণ্ট ৭৯

মুখবন্ধ

রাঙ্গামাটি তথা উদয়পুর ত্রিপুরদের প্রাচীন রাজধানী। লিকা রাজাদের পরাস্ত করে সুদূর অতীতে ত্রিপুরগণ এখানে তাঁদের প্রধান ঘাঁটি গড়ে এক বিস্তৃর্ন অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা পত্তন করেছিলেন এবং প্রায় হাজার বছরেরও বেশীকাল এখানে কাটিয়ে এক প্রবল ঐতিহাসিক বিপর্যয়ে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে আগরতলাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দীর্ঘকালীন রাজধানীর সুবাদে এখানে গড়ে উঠেছিল জমজমাট জনপদ এবং বিশিষ্ট ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র। নাগরিকদের জীবন যাত্রা প্রবাহিত হত সেকালের নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঘিরে। সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীকরূপে এখানেই গড়ে উঠেছিল নানা সৌধ নানা চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে। ঐ সব প্রতিষ্ঠান ও সৌধসমূহ ভিত্তি করেই আবর্তিত হত সেকালের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন স্রোত। পরিত্যক্ত হবার ফলে গুরুত্বহারা জনপদ ক্রমে জনশূন্য হয়ে বনে জঙ্গলে ঢেকে যায়। সভ্যতার নিদর্শনগুলি কালের করাল করস্পর্শে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে।

স্বাধীনতার ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে ঘটেছে দ্রুত জনসমাবেশ এবং পরবর্তীকালে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মঠ মন্দির প্রভৃতি প্রাচীন সৌধ বা ধ্বংসস্তুপগুলি অবলুপ্ত হতে থাকে দ্রুত। সাধারণ মানুষের কাছে জীবিত মানুষের দাবী মৃত মানুষের স্মৃতির চেয়ে বরাবরই অধিক প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। ফলে হাজার বছরের প্রাচীন রাজধানীর ঐতিহাসিক সাক্ষ্য সমূহ ঘোর বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক বিবরণী নেই এই প্রাচীন রাজধানীর। আগামী প্রজন্মের নিকট হয়ত একেবারে অজ্ঞাত অবজ্ঞেয় হয়ে পড়বে এই ঐতিহাসিক উদয়নগরী। এই অবক্ষয়ের মুখে একটি প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বিবরণী রচনার চেতনা দেখা দেয় মনে, তারই ফলশ্রুতি এই অক্ষমের রচনা "ত্রিপুর-রাজধানী উদয়পুর।"

বিভিন্ন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য, যেমন মন্দির, মসজিদ, সৌধ, জলাশয় প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে একদিকে, অপর দিকে তেমনি নানা সাহিত্যিক আকরগ্রন্থের সাক্ষ্যও পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত রাজধানীর ইতি কথা তৈরীর কাজে। শিলালিপি, মুদ্রাসাক্ষ্য নানা স্থানে আলোকসম্পাত করেছে। ফলে প্রচলিত গল্পকথা অসার প্রতিপন্ন হলেও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের ভিত্তি প্রস্তুত করেছে। সাক্ষ্যের অপ্রতুলতায় প্রতিপদেই হোঁচট খেতে হয়েছে, তবু প্রচেষ্টা স্তব্ধ হয়ে যায়নি এবং ভবিষৎ গবেষণার পথিকৃৎরূপে এই ইতিকথা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডঃ নিশীথ রঞ্জন রায় মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে, নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করে এবং সুচিন্তিত নির্দেশাদি দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। এই জ্ঞান তপস্বীকে প্রণাম জানাই। গবেষণা

বিভাগের প্রাক্তন অধিকারিক ও বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমার্হতা শ্রীযুক্ত আলোকময় দত্ত মহাশয় এই উদ্যোগ মুদ্রণে প্রয়াসী হন। তাঁর অসমাপ্ত কাজ নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বর্তমান অধিকর্তা শ্রীযুক্ত লোকেশ চন্দ্র দাস মহাশয় এবং লিঙ্গুয়িষ্টিক অফিসার শ্রীযুক্ত দেবপ্রিয় দেববর্মন মহাশয় যে ভাবে সম্পন্ন করতে চলেছেন তা সত্যিই ধন্যবাদার্হ। এই প্রসঙ্গে রামগোপাল সিংহ মহাশয়ের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। নথিভুক্ত সাক্ষ্যসমূহের আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী মৃদুলা গোস্বামী। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। –ইতি

বিনীত

আগরতলা, মহালয়া, ১৪০০ ত্রিপুরাব্দ/১৩৯৭ বঙ্গাব্দ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী

ভূমিকা

সম্প্রতি আমাদের ইতিহাস আলোচনা ক্ষেত্রে দুটি সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে–এক, বাংলা ভাষায় ইতিহাস আলোচনার পরিধি উল্লেখনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই, বিষয়বস্তু হিসেবে ক্রমশ বেশী মাত্রায় বেছে নেওয়া হচ্ছে স্থানীয় ইতিহাস। শুধু প্রদেশভিত্তিক বা রাজ্যভিত্তিক নয়, জেলা ভিত্তিক, মহকুমাভিত্তিক, এমন কি শহরভিত্তিক। ইতিহাস-আলোচনার এই আধুনিক প্রবণতা খুবই আশাব্যঞ্জক। গোটা দেশ বা গোটা সমাজের ইতিহাস চর্চার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে একথাও মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই যে বহু-বিস্তৃত একটি দেশের অথবা বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মাশ্রয়ী নরনারীদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটি বিশালায়তন জন-সমাজের ইতিহাস তুলে ধরতে গেলে সেখানে খুঁটিনাটি অনেক তথ্যই অনুল্লেখিত থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু যেখানে আলোচনা বা গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয় একটি সীমিত আয়তনের ভূখণ্ড অথবা নির্দিষ্ট কোন একটি অঞ্চলের অধিবাসী, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন জনগোষ্ঠী, সেখানে সামগ্রিক বিষয়ের মূল কাঠামোটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খুঁটিনাটি তথ্যের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব। এইভাবে আঞ্চলিক ইতিহাস ক্রমে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সামগ্রিক ইতিহাস একাধারে আরও তথ্যসমৃদ্ধ এবং দিগ্‌দর্শী হবে–সঙ্গত কারণেই আশা করা যেতে পারে। আঞ্চলিক ইতিহাস সামগ্রিক ইতিহাসেরই পরিপূরক, উভয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ একই।

মাত্র কয়েকটি বছরের ব্যবধানে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় ত্রিপুর জাতি এবং ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাস নিয়ে কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজীর তুলনায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বই-এর সংখ্যাই বেশী। 'রাজমালার' মতো আকরগ্রন্থও পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। এ সবই আমাদের ক্রমবর্ধমান ইতিহাস চেতনার লক্ষণ।

শ্রী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী তাঁর আলোচ্য বিষয় বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন ত্রিপুর–রাজধানী উদয়পুরের ধারাবাহিক ইতিহাস। উদয়পুরের গৌরব আজ অন্তর্হিত। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের এককালীন এই রাজধানী বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং সামরিক জয় পরাজয়ের সাক্ষী। সামাজিক বিবর্তনের বহু ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে এর জনজীবনে। রাজধানী সুলভ সমৃদ্ধির সাক্ষী এখানকার বিভিন্ন রাজপ্রসাদ, কৃত্রিম জলাশয়, মঠ মন্দির। রাজ্যের অর্থনীতির প্রতিফলনও ঘটেছিল এখানকার পণ্য বিনিময় কেন্দ্রে, হস্ত শিল্পে, ব্যবসায় বাণিজ্যে। গ্রন্থটিতে রাজবৃত্ত অবশ্যই নিজ অধিকারে স্থান লাভ করেন, কিন্তু জনজীবনও এতে উপেক্ষিত নয় বরং গ্রন্থকার সাধারণ মাত্রার চাইতে বেশী মাত্রায় সেখানকার বিভিন্ন বৃত্তিভুক অধিবাসীদের জীবনচর্যার রূপটি সংক্ষেপে হলেও নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়ের নামকরণের মাধ্যমে গ্রন্থকারের ইতিহাস চেতনার ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট – রাঙ্গামাটি হল উদয়পুর, রাজধানীর অধিবাসী, উদয়নগরী, ত্রিপুরার রাজবাড়ী, রাজধানীর অর্থনৈতিক অবস্থা, যোগাযোগের ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, লুণ্ঠিত রাজধানী, উৎসব অনুষ্ঠান, ইতিহাসের সাক্ষী-প্রাসাদ মন্দির, দেউল, দরগাহ্, জনস্বাস্থ্য, দীঘিময় উদয়পুর। গ্রন্থকার প্রধানত সাহিত্যিক উপাদানের উপর নির্ভর করেছেন।

দু'টি একটি ক্ষেত্রে শিলালেখের উল্লেখও রয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ অঞ্চলে সাহিত্যিক উপাদান যতো সহজলভ্য, শিলালিপি ততো নয়। সাহিত্য উল্লেখিত ঘটনা কোন কোন ক্ষেত্রে অনৈতিহাসিকতাদোষে দুষ্ট হতে পারে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা যতোদিন আরও ব্যাপক না হয়, ততোদিন সাহিত্যের উপর প্রায় একক নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের আওতায় যে সব অঞ্চল এসেছিল তাদের ক্ষেত্রে সাহিত্যেতর ঐতিহাসিক উপাদানের মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী। কেন্দ্র-রাজ্য সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ বেশী মাত্রায় পাওয়া সম্ভব। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন ত্রিপুরারাজ্যের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। সুতরাং এখানে সাহিত্যিক উপাদান অপরিহার্য। ভবিষ্যতে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক মাল মসলার উপর প্রায় একান্ত নির্ভরশীলতার বাধা অনেকখানি অপসারণের উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে—এই প্রত্যাশাটুকুই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

নিশীথ রঞ্জন রায়

ত্রিপুরা রাজ্য (স্কেল অনুযায়ী নয়)

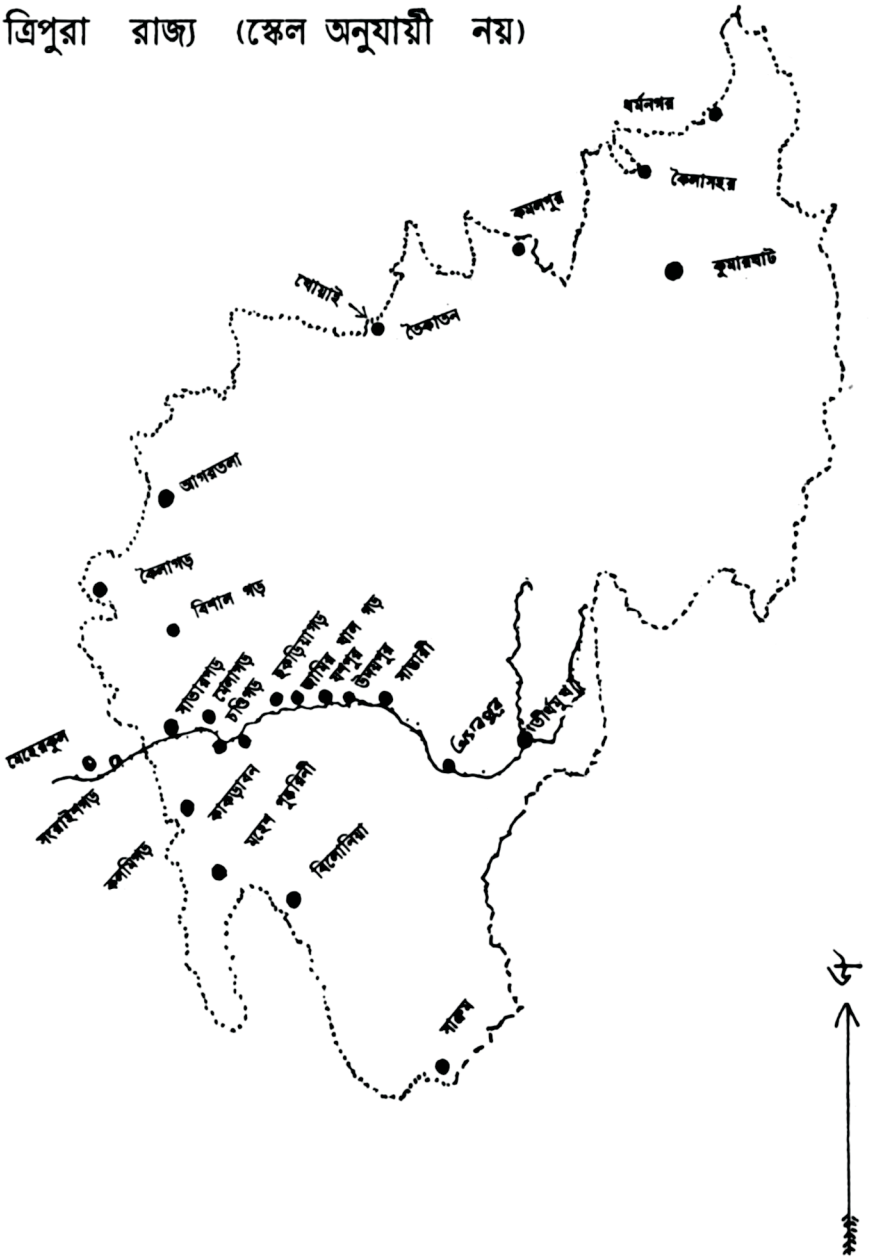

প্রথম অধ্যায়

রাঙ্গামাটি হল উদয়পুর

রাঙ্গামাটি ত্রিপুর-রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী। ত্রিপুরগণ নানা ঘাত প্রতিঘাতের ফলে ক্রমাগত রাজ্য ত্যাগ ও রাজধানী পরিবর্তন করে ত্রিবেগ থেকে ক্রমে খলংমা, ধর্মনগর প্রভৃতি স্থানে রাজপাট স্থাপন করেন। আরও দক্ষিণে রাঙ্গামাটিতে তখন রাজত্ব করত লিকা রাজগণ। এই লিকা রাজাদের হাত থেকে ত্রিপুররা রাঙ্গামাটি ছিনিয়ে নেন। এই লিকারা কারা ? নানাজন তাদের সম্বন্ধে নানামত পোষণ করেন। শ্রীরাজমালা সম্পাদকের মতে লিকারা মগজাতির শাখা সম্ভূত একটি জনগোষ্ঠী।[১]

বর্মীদের অত্যাচারে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে আরাকানের মগেরা ক্রমশঃ উত্তরে সরে আসতে থাকে। সাক্রম, বিলোনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের পথ ধরে বর্তমান কালের উদয়পুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পূর্ব বসতির স্মৃতিতে এই অঞ্চলের নামও রাখে "রাঙ্গামাটি"। • • • বর্মীদের চোখে ওরা ছিল "লিকা" আর ত্রিপুরীসমাজে ওরা হল "রোহাঙ্গিয়া" বা "রোহাং"। কয়েক শতাব্দীর বিবর্তনের ফলে শব্দটি থেকে "রিহাং" বা "রিয়াং" শব্দটি পাওয়া গেল।[২] মগরা ত্রিপুরীদের MRUNG বলে। এই ফং এর অর্থ হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিত্যক্ত স্থানে বসবাসকারী। এর থেকে ধারণা করে যেতে পারে যে ত্রিপুরীদের পূর্বে রাঙ্গামাটিতে মগরা বসবাস করত এবং তাদের পরিত্যক্ত স্থানই ত্রিপুরীরা দখল করে বসবাস শুরু করে।

রাজমালার মতে রাঙ্গামাটি ত্রিপুর-রাজের করদ রাজ্য ছিল। লিকা রাজাগণ কর দেয়া বন্ধ করার ফলে ত্রিপুররা রাঙ্গামাটি আক্রমণ করে। যথা ঃ

আগে অধিকার ছিল রাঙ্গামাটি স্থল।
রাজকর না দি সেই হইছে প্রবল ॥[৩]

ত্রিপুর-রাজ যুঝার ফার আক্রমনে লিকা রাজা পরাস্ত হলেন এবং রাঙ্গামাটি থেকে বিতারিত হলেন। ত্রিপুর-রাজ রাঙ্গামাটি সরাসরি নিজ শাসনে আনলেন এবং রাঙ্গামাটিতে ত্রিপুর-রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন। শ্রীরাজমালার মতে হামতার ফা রাঙ্গামাটি দখল করেন এবং যুঝার ফা হামতারফার নামান্তর।[৪] কিন্তু রাজমালা ভিন্নমত পোষণ করে। যথা ঃ

"তার পুত্র নাওড়াই হইল প্রধান।
হামতার ফা তার পুত্র হইল ধনবান ॥
হামতার ফার পুত্র পুনি যুঝার ফা হইল।
বহুযুদ্ধ করিয়া সে রাঙ্গামাটি লইল ॥[৫]

তাহলে হামতার ফা নন, তাঁর পুত্র যুঝারফাই রাঙ্গামাটি দখল করেন এবং এই স্থানে রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। লিকা রাজা বা তাদের পরবর্তী ফা

উপাধিধারী ত্রিপুর রাজাদের রাজত্বকালের রাজধানীর বিবরণ উপযুক্ত ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের অভাবে জানা যাচ্ছেনা।

যুঝার ফা থেকে শুরু করে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য (১৭৬০ খৃঃ–১৭৮৩ খৃঃ) পর্যন্ত ৫৬জন নরপতি এই স্থান থেকেই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

"এগারশ সত্তর সন হএতে যখন।
আগরতলা রাজধানী করিল রাজন॥"[৬]

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৭৬০ খৃঃ) আগরতলাতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং ঐতিহাসিক রাঙ্গামাটি রাজধানীর গৌরব চ্যুত হয়। শ্রী রাজমালা সম্পাদকের মতে যুঝার ফা বঙ্গদেশের কিয়দংশ (বিশালগড়) জয় করে বিজয়স্মারক স্বরূপ ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেন।[৭] ৫৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে ত্রিপুরাব্দ গণনা করা হয়, তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে ৫৯০ খৃষ্টাব্দ বা তার কিছু পূর্বে রাঙ্গামাটি ত্রিপুরার রাজধানীতে পরিণত হয়। ৫৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১১৭০ বৎসর রাঙ্গামাটি ত্রিপুরার রাজধানী ছিল, ইহাও কম গৌরবের কথা নয়।

ঐতিহাসিক কালের নৃপতি হিসেবে ত্রিপুর-রাজ ১ম রত্নমাণিক্য মাণিক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রচারিত ১৩৮৬ শকাব্দের মুদ্রাই অদ্যাবধি প্রাপ্ত ত্রিপুরার রাজাদের প্রথম মুদ্রা। "তাঁর মুদ্রাতে টাকশালের নাম হিসেবে "রত্নপুরে"–এই কথা লেখা আছে। রত্নপুর নিঃসন্দেহে রত্নমাণিক্যের রাজধানী ছিল। সেখানে তাঁহার টাকশালও ছিল। রত্নমাণিক্যের পর আর কোন ত্রিপুরা রাজের মুদ্রায় টাকশালের নাম নেই।"[৮] কোথায় ছিল এই রত্নপুর ? হাজার বছরের রাজধানী একই স্থানে অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট এলাকাতে স্থির এই থাকবে আশা করা যায়না। রাঙ্গামাটির বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় বিধ্বস্ত ইটের পাঁজা। রাজনগর, ফুলকুমারী, চন্দ্রপুর, কমলাসাগর, রত্নপুর, ধ্বজনগর ইত্যাদি মৌজাতে রাজধানীর চিহ্নাদি দেখা যায়। এমনি আরও কত জনপদ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে কে জানে ? মৌজা রত্নপুরে বিজয় মাণিক্য বিজয়সাগর খনন করান। বিজয় সাগর বর্তমানে মহাদেব দীঘি নামে পরিচিত। মহাদেব বাড়ী মন্দির গুচ্ছও রত্নপুরের অন্তর্গত। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য (১৯০৯-১৯২৩ খৃঃ) তাঁর পিতা রাধাকিশোর মাণিক্যের (১৮৯৩-১৯০৬ খৃঃ) স্মৃতিতে রত্নপুরের নাম পরিবর্তন করে "রাধাকিশোরপুর" রাখেন।[৯] এর জন্যেই রত্নপুর আমাদের স্মৃতির আড়ালে চলে গেছে।

মহারাজ উদয় মাণিক্য (১৫৬৭-১৫৭৩ খৃঃ) রাঙ্গামাটির নাম পরিবর্তন করে 'উদয়পুর' নাম রাখেন। মাণিক্য বংশীয় নৃপতি অনন্ত মাণিক্য (১৫৬৫-১৫৬৭ খৃঃ) স্বীয় শ্বশুর ও সেনাপতি গোপী প্রসাদের ষড়যন্ত্রে পাচিকা দ্বারা গোপনে নিহত হন।[১০] সেনাপতি গোপী প্রসাদ স্বয়ং উদয় মাণিক্য নাম নিয়ে ত্রিপুর সিংহাসনে বসেন এবং চন্দ্রপুরে রাজপাট স্থানান্তরণ করেন। চন্দ্রপুরে প্রথম উদয় মাণিক্যের প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ আজও বিদ্যমান। রাজমালাতে উল্লেখ আছে যে–

"গোপী প্রসাদ নারায়ণ সেনাপতি ছিল।
অনন্ত মাণিক্য পরে সেই রাজা হইল।।

* * * *
উদয় মাণিক্য রাজা নাম হৈল তার ॥
উদয় মাণিক্য রাজা চন্দ্রপুরে গেল ।
নিজগৃহ সিংহসন সেখানে করিল ॥
* * * *
রাঙ্গামাটির নাম উদয়পুর কৈল ।
উদয় মাণিক্য রাজা উদয়পুরে মৈল ॥"[১১]

এই উদয়পুর নাম আজও চালু আছে, যদিও কিয়দংশ পরবর্তীকালে রাধাকিশোরপুর নামে পরিচিতি লাভ করেছে। খুব সম্ভবত ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গামাটি উদয়পুরে পরিণত হয়, কিন্তু বর্তমান উদয়পুর প্রাচীন রাঙ্গামাটির কিয়দংশ মাত্র।[১২]

–ঃ পাদটীকা ঃ–

১। সেন কালী প্রসন্ন (সম্পাদিত) ঃ শ্রীরাজমালা, ১ম লহর, মধ্যমণি, আগরতলা, ১৩৩৬ ত্রিং, পৃঃ ১৯৩ (পরে শ্রী রাজমালা)।

২। ভট্টাচার্য অনাদি ঃ রাজমালায় উল্লিখিত লিকা কারা ? গোমতী, কার্তিকসংখ্যা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬।

৩। শিক্ষা বিভাগ ঃ ত্রিপুরা সরকার (সম্পাদিত) ঃ রাজমালা, আগরতলা, ১৯৬৭ ইং, পৃঃ ১৫, (পরে রাজমালা)।

৪। শ্রী রাজমালা, ১ম লহর, পূর্বে উল্লিখিত , পৃঃ ২৯৬।

৫। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৬।

৬। শ্রী রাজমালা, ৪র্থ লহর (অপ্রকাশিত), পৃঃ ৫১।

৭। শ্রী রাজমালা, ১ম লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৯১।

৮। মজুমদার রমেশচন্দ্র (সম্পাদিত) ঃ বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, কলিকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৮৭, (পরে রমেশচন্দ্র)।

৯। শ্রী রাজমালা, দ্বিতীয় লহর, আগরতলা, ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ, পৃঃ ৩১২।

১০। সিংহ কৈলাসচন্দ্র ঃ রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, কুমিল্লা, ১৮৯৬ ইং, ২য় ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৬২ (পরে কৈলাসচন্দ্র)।

১১। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪৪-৪৬।

১২। দত্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ঃ উদয়পুর বিবরণী, আগরতলা, ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দ, পৃঃ ২ (পরে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজধানীর অধিবাসী

রাঙ্গামাটিতে নতুন রাজধানী স্থাপন করে যুঝার ফা পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দিলেন। এখানে প্রশ্ন আসে নতুন রাজধানীর অধিবাসী কারা ? কাদের নিয়ে ত্রিপুর-রাজ রাজধানী পত্তন করেছিলেন ? কেমন ছিলেন তারা সেকালের রাজধানীতে ? অবশ্যই রাজার পরিজন, জ্ঞাতি গোষ্ঠী বারো ঘর ত্রিপুরের লোকেরা নতুন রাজধানীতে বসবাস করতেন। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মচারী ও সেবকগণ নিশ্চয়ই রাজধানীতে বাস করতেন বলে অনুমান করা যায়। লিকারাজার দশ হাজার সৈন্য পরাস্ত করতে নিশ্চয়ই ত্রিপুর-রাজের বিরাট কাহিনী নিয়োগ করতে হয়েছিল। পরাস্ত লিকা সৈন্যদের পরে সৈন্য বিভাগে এবং অন্যান্য কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। শ্রী রাজমালার মতে –

"লিকা জাতি করিলেক আপনার দল।
তার সৈন্য সেনা দিয়া করে নিজ বল॥"[১]

কালক্রমে বিজিত লিকারা বৃহত্তম ত্রিপুর সমাজে মিশে গেল। বিজিত লিকা জনগণ ও বিজয়ী ত্রিপুর-সেনাগণও খুব সম্ভবত রাজধানী বা রাজধানীর আশে পাশে বসতি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজমালা বা অন্য কোন প্রাচীন পুস্তকে রাজধানীর অধিবাসীদের কোন বিবরণ নাই। তারপরে বঙ্গদেশের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে এবং পরবর্তীকালে মেহেরকুল অধিকৃত হওয়ার পরে সমতল বঙ্গদেশের লোক জয়ী রাজার সঙ্গী হিসেবে বা অন্য কোন কারণেও রাজধানীতে এসে থাকতে পারে। কিন্তু যথোপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে এরূপ ধারণা থেকে সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না।

মহারাজ প্রথম রত্নমাণিক্য বঙ্গদেশের রাজধানী লক্ষণাবতীতে অবস্থান কালে বঙ্গদেশীয় লোকজনের সংস্পর্শে আসেন। রত্নমাণিক্যের গৌড়ে প্রবাস জীবনযাপন শুধু ত্রিপুরার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। উন্নততর শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ত্রিপুর রাজপুত্রের চোখে নবদিগন্ত খুলে দিয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে রাজা রত্নমাণিক্য গৌড়েশ্বরকে দশটি হাতী উপহার দিয়ে বঙ্গদেশের লোক ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করাবার অনুমতি লাভ করেন। গৌড়েশ্বর বার বাঙ্গলার অধিবাসী দশ হাজার পরিবার নবসেনা, ভদ্রলোক ও শ্রীকরণ বাঙ্গালীদের রত্নমাণিক্যের সাথে ত্রিপুরাতে যেতে অনুমতি দেন। রত্নমাণিক্য এসব বাঙ্গালীদের রাজধানী ও রাজধানীর চারপাশে বসবাস করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ত্রিপুর রাজধানীতে বাঙ্গালীদের বসবাস শুরু হল এবং ত্রিপুরার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

এই 'নবসেনা' কারা ? রাজা তাঁদের কোথায় বসতি গড়তে দিলেন ? 'নবসেনা' হচ্ছে নয় শাকজাতি অর্থাৎ নয় শুদ্র জাতি। গোপ, মালাকার, তিলি, তাঁতি, মোদক,

বারুই, কুমোর, কামার ও নাপিত নয় শূদ্রজাতি বলে বঙ্গীয় সমাজে গণ্য করা হত।[২] শ্রীকরণ অর্থাৎ মসিজীবি যারা লেখার কাজ করে জীবিকা পালন করতেন। ওরা বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীভূক্ত। এসব বঙ্গলোকদের প্রথম রত্নমাণিক্য নিজ রাজধানীতে এবং রাজধানীর আশেপাশের পল্লীতে অভিবাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রী রাজমালার মতে–

'রাঙ্গামাটি দুই হাজার ঘর বসাইল॥
রত্নপুরে বসাইল সহস্রেক ঘর।
যশপুরে বসাইল পঞ্চশত পর॥
হীরাপুরে পঞ্চশত ঘর বসাইল।
এই মতে রাঙ্গামাটি নবসেনা গেল॥[৩]

রাঙ্গামাটি ও রত্নপুর রাজধানীর দু'টি এলাকা। যেমন একালের কৃষ্ণনগর ও বনমালীপুর। যশপুর রাঙ্গামাটির উত্তর দিকের একটি গ্রাম। রাজধানীতে আসার পথে শহরতলীতে অবস্থিত। রাজমালার মতে–

'যশপুর ছাড়ি রাজা রাঙ্গামাটি আইল।৪

হীরাপুর উদয়পুর-অমরপুর পথে মহারানীর কাছাকাছি একটি গ্রাম। হীরাপুরের প্রাচীনত্ব ও সম্ভ্রান্ততা শ্রী রাজমালার ১ম লহরের এই শ্লোকে ঘোষিত হচ্ছে। রত্নমাণিক্য বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠী এনে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। চিরকালীন খাদ্যসংগ্রাহক ত্রিপুর সমাজে নবসেনার যোগদানের ফলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি নূতন অর্থনৈতিক ধারার সূচনা হয়েছিল।

রত্নমাণিক্য লক্ষণাবতীতে তিনজন সম্ভ্রান্ত বাঙালীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ত্রিপুর রাজধানীর অধিবাসীদের প্রসঙ্গে এঁদের কথা না বললে রাজধানীর বাসিন্দাদের তালিকা অপূর্ণ থেকে যাবে। এই তিনজন বাঙালী হচ্ছেন কায়স্থ ঘোষ বংশজ বড়খাণ্ডব ঘোষ, রাজবংশজ পণ্ডিতরাজ এবং সেন বংশীয় জয়নারায়ণ সেন।[৫] রাজা হয়ে রাজধানীতে ফিরে আসার কালে এই তিন ভদ্রলোককে রত্নমাণিক্য নানা প্রলোভন দেখিয়ে রাজধানীতে নিয়ে আসেন। 'প্রলোভন' বলতে পুরুষানুক্রমিক প্রতিপালন, বৃত্তিদান, নিষ্কর জমিদান, জায়গীরদান ইত্যাদি বুঝান হয়েছে। এই ঘোষ, রাজ এবং সেন বংশীয় লোকেদের সাহায্যে রত্নমাণিক্য বঙ্গদেশের শাসনপ্রণালী মোতাবেক ত্রিপুরার শাসন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করেন। বস্তুত পক্ষে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজ্যলাভের পূর্ব পর্যন্ত এই বঙ্গজ লোকেদের বংশধরগণই পুরুষানুক্রমে ত্রিপুরার রাজসরকারে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। উজীর, দেওয়ান, সেনাপতি থেকে শুরু করে সামান্য লেখকের কাজও তারা করতেন। অতি বিশ্বস্ত ছিলেন বলে তাদের 'বিশ্বাস' উপাধি দেয়া হয়েছিল। রাজার ভাগ্যবিপর্যয় ও রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারাও ছায়ার মত রাজাকে অনুসরণ করে নূতন রাজধানীতে বাসভবন নির্মাণ করে রাজার কাজ করতেন।[৬] রাঙ্গামাটি বা উদয়পুরেও নিশ্চয়ই তাঁরা বাস করতেন।

গৌড়ের মুসলমান সুলতানের সাহায্যে ত্রিপুর সিংহাসন দখল করলেও 'শ্রীদুর্গা পদপরঃ,' 'শ্রীনারায়ণ চরণ পরঃ' ও শ্রী পার্বতী পরমেশ্বর চরণ পরৌ' রত্নমাণিক্য তার

হিন্দু রাজ্যে মুসলমান প্রজার বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে কোন ইঙ্গিত রাজমালাতে পাওয়া যায়না। তবে পরবর্তী কালে বিভিন্ন মুসলমান আক্রমণের ফল স্বরূপ রাজধানীতে মুসলমান প্রজাপত্তন শুরু হয়। একইভাবে আরাকানী আক্রমণের ফলস্বরূপ সেকালে রাজধানীতে মগ প্রজাও বসবাস করতে শুরু করে। মুসলমানও মগ প্রজাবৃদ্ধির বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিবৃত করার চেষ্টা করা হবে। ত্রিপুরা বুরঞ্জীর মতে ১৭০৯-১৭১৫ খৃষ্টাব্দে আসামের রাজদূতগণ অমরসাগর দীঘির চারপাড়ে নগরীর লোকজন বিশেষ করে তাঁতী, সোনার, কামার, কুমোর, চর্মকার, কুন্দার, ধোবা, বারুই প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেদের বসবাস করতে দেখেছেন। বিজয়সাগর দীঘির চারপাড়েও এরূপ প্রজাবসতি ছিল এবং তারা লক্ষ্য করেছেন যে এই দুই দীঘির মাঝের স্থলভাগে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, দৈবজ্ঞ, মালাকার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেদের বসবাস ছিল। রাজধানীর চারিদিকে পার্বত্য অঞ্চলে ত্রিপুরীরা বাস করত। রাজবংশীয় রাজপুরুষগণ রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করতেন।[৭]

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৩১১ ত্রিপুরাব্দ থেকে ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রায় তের বছর উদয়পুরের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের পদে কাজ করেছেন। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত লিখিত 'উদয়পুর বিবরণী' পুস্তক থেকে জানা যায় যে পূর্বে উদয়পুরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ভদ্র প্রভৃতি নানা বর্ণের লোক বাস করত। পাহাড়ে ও সমতল ভূমিতে নানাজাতীয় লোক বাস করত। ভট্টের পুষ্করিণী, ঠাকুরের পুষ্করিণী, ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালিনীর পুষ্করিণী, বাসুয়াপাড়া, চাড়াল পাড়া, ডোম পাড়া, গোয়াল গাঁও, কামারের পুষ্করিণী, তেলী পুষ্করিণী ইত্যাদি জলাশয় ও পাড়ার নামে থেকে রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকবসতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "যতদিন এখানে রাজা ও রাজধানী ছিল, ততদিন লোকসংখ্যা ও যথেষ্ট ছিল। রাজা চলিয়া যাওয়ার পর উদয়পুরবাসী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক প্রভৃতি, সন্নিকটবর্তী বৃটিশ এলাকার বিভিন্ন জেলাসমূহে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলার অনেক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বাসস্থান উদয়পুরে ছিল বলিয়া কয়েকটি বংশের খ্যাতি প্রচলিত আছে; কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকে সামাজিকভাবে গ্লানিজনক মনে করিয়া তাহা স্বীকার করেন না।"[৮] দত্ত মহাশয়ের মতে মাতার বাড়ীর পুরোহিত বংশ, চন্দ্রপুর মৌজার লস্কর বংশ, খিল পাড়ার বারুজীবিরা, চন্দ্রপুর মৌজার মুসলমান চৌধুরী বংশ, উত্তর চন্দ্রপুরের কাজী বংশ ও ফিরোদ আলী সর্দারের বংশ, খিল পাড়া নিবাসী আম্বর আলী ও মহম্মদ হাজিমের বংশ উদয়পুরের প্রাচীন বংশাবলীর অন্যতম।

সোনামুড়া নিবাসী হাসানআলী হাতীর দাঁতের কারুশিল্পে দক্ষ শিল্পী ছিলেন। সোনামুড়ার ইমামবক্স পোদ্দারের পূর্বপুরুষরা স্বর্ণকার ছিলেন। এছাড়া সোনামুড়ার মৃধাবংশ, চন্দ্রপুরের ভূঞা বংশ, খিল পাড়ার পালোয়ান বংশ ও সোনামুড়ার খাদিমগণ ও রাজধানীর প্রাচীন বসবাসকারীদের বংশধর বলে দাবী করেন। প্রকৃতপক্ষে ক্রমাগত বাহিরাক্রমণ ও রাজগণের রাজধানী ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুর গুরুত্বহীন হয়ে পড়লে ভাগ্যান্বেষী সম্ভ্রান্ত প্রজাগণ, রাজপুরুষ ও কর্মচারীগণ পুরনো রাজধানীর বাস

উঠিয়ে নূতন রাজধানীতে জীবিকার সন্ধানে চলে যায়। ক্রমে এককালের জমজমাট লোকালয় জনশূন্য হয়ে বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

পরবর্তীকালে দেশবিভাগের ফলে উপরে উল্লিখিত প্রাচীন বংশগুলির বর্তমান পুরুষেরা অনেকে বর্তমান বাংলা দেশে চলে যায়। অনেকে অবশ্য এখনও এখানেই বসবাস করছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু প্রজাদ্বারা পুরনো রাজধানী আবার জনপূর্ণ হয়ে উঠে।

–ঃ পাদটীকা ঃ–

১। শ্রী রাজমালা, প্রথমলহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫২।

২। তদেব ঃ পৃঃ ৬৮।

৩। তদেব ঃ পৃ ৬৯

৪। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পশৃঃ ৩০।

৫। কৈলাসচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, ২য়ভাগ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ৩০–৩১।

৬। তদেব ঃ পৃঃ ৩২।

৭। তুঞা সূর্যকুমার ঃ ত্রিপুরা বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৫২ ইং, পৃঃ ৩২-৩৩ (পরে ত্রিপুরা বুরঞ্জী)।

৮। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪১।

তৃতীয় অধ্যায়

উদয়নগরী

আসামের রাজা স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে রত্নাকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগী নামক দুইজন দূত ত্রিপুরার রাজা ২য় রত্নমাণিক্যের দরবারে পাঠান। রুদ্রসিংহের এই কূটনৈতিক তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বন্ধুভাবাপন্ন হিন্দুরাষ্ট্রগুলিকে ঐক্য বদ্ধ করা। উক্ত দূতদ্বয় মোট তিনবার উদয়পুর যাতায়াত করেন এবং রাজআতিথ্যে রাজধানী উদয়পুরে বাস করেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ২য় ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে তারা শেষবারের মত ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। ত্রিপুরাতে থাকাকালে তারা ত্রিপুরার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে ছিলেন কারণ সম্মানিত রাজদূত হিসেবে অনেক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন। অপর দিকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যক রূপে অবগত হবার জন্য তারা গুপ্তচরও নিয়োগ করেছিলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তারা আসাম-রাজের নিকট "ত্রিপুরা দেশের কথার লেখা" নামে একটি বিবরণী পেশ করেন। উহা "ত্রিপুরা বুরঞ্জী" নামে খ্যাত। উদয়পুর পরিত্যক্ত হবার পঞ্চাশ বছর আগে রাজধানীর অবস্থা কিরূপ ছিল তার ধারণা আমরা উক্ত বিবরণী থেকে পাই। ত্রিপুর চন্দ্র সেন মহাশয় উক্ত ত্রিপুরা বুরঞ্জীর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। এই পুস্তক বর্তমানে দুর্লভ। রাজধানী ও রাজপ্রাসাদের বিবরণ আমি "ত্রিপুরা বুরঞ্জী" থেকে যথাসাধ্য অনুবাদ করেছি। কোন কোন স্থানে ত্রিপুর সেনের পুস্তকেরও সাহায্য নিয়েছি। ত্রিপুরা বুরঞ্জীতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সেকালের রাজধানীর একটি অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছি।

ত্রিপুরা বুরঞ্জীর বিবরণীতে দেখা যায় যে রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে গড়ের অনতিদূরে গোমতী নদী প্রবাহিত হত। দক্ষিণ দিকে ছিল রাজবাড়ীর প্রধান দরজা। এই দরজার সামনে 'রাজহাট' নামে একটি বাজার বসত। হাটের মাঝখানে ছিল একটি রাজপথ। এই রাজপথের দুইধারে বণিক, ব্যাপারী এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি দোকান ঘর ছিল। দোকান ঘরের পেছনেই ছিল ব্যবসায়ীদের বাড়ী। বাড়ীর পেছনে বেল, নারিকেল ইত্যাদি ফলের গাছ এবং দোকানের সামনে তুলসীমঞ্চ শোভা পেত। অবশ্য সব দোকানের সামনে তুলসী মঞ্চ ছিল না। তুলসীমঞ্চ ইট দিয়ে বাঁধান এবং রোজ তুলসীর পূজো করা হত। এই রাজপথের দৈর্ঘ দূতগণ অনুমান করেছেন আসামের রঙ্গপুরের গম্বুজ থেকে হজরেঙ্গার পুকুর পর্যন্ত রাস্তার মত। এ ভাবে তারা অনকে ক্ষেত্রেই দূরত্বের তুলনা করেছেন। রাজপথের দুই ধারেই লাগালাগি দোকান ঘর ছিল এবং মাঝে মাঝে বাজার ছিল।[১]

এই রাজপথের প্রায় মাঝামাঝি স্থান থেকে আরও একটি রাস্তা অগ্নিকোণের দিকে বেরিয়েছিল দূতগণ লিখেছেন। আলোচ্য রাস্তাটির দৈর্ঘ তাদের রাজধানীর বড়চড়া

থেকে ওগরিহাট পর্যন্ত পথের দূরত্বের সমান বলে তারা অনুমান করেছেন। এই রাস্তার দুই ধারে কেনাবেচার নানারকম বিপনি ও মাঝে মাঝে বাজার ছিল। রাস্তার শেষ প্রান্তে ইটের ভিটিতে কাঠ-বাঁশের তৈরী দুইটি চৌচালা ঘর দূতগণ দেখেছেন। তারা লিখেছেন যে ঐ ঘরে চতুর্দ্দশ দেবতার মূর্তিছিল। তারা লক্ষ্য করেছেন চতুর্দ্দশ দেবতার পূজো বছরে একবার হত এবং চোনতাই নামে একদল পুরোহিত চতুর্দ্দশ দেবতার পূজো করতেন। চোনতাইদের সঙ্গে দূতগণ তাদের দেশের দেওধাই নামক পুরোহিতদের তুলনা করেছেন। মোষ, গবয়, শুকর, মুরগী, হাঁস, কবুতর, পাঁঠা, হরিণ, মাছ, কচ্ছপ ও মদ দিয়ে চৌদ্দদেবতার পূজো সম্পন্ন করা হত। এই পূজোতে রাজা নিজেও যোগদান করতেন।[২]

এই রাস্তার মোড়ে গোমতী নদী বাঁক নিয়েছিল। নদীর অপর পাড়ে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বত। সেখানে ত্রিপুরীরা বাস করত। মগদেশ বিজয়কালে মগদেশ থেকে যে সব লোক ধরে আনা হয়েছিল তাদের সেখানে বসান হয়েছিল। রাস্তার পূবপাশে ঢপলিয়া পর্ব্বতে ত্রিপুরীদের বসবাস ছিল। আরও পূবে কেবলই পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং ঐ অঞ্চলেও ত্রিপুরীরা বাস করত। ঢপলিয়া পর্ব্বতের নিকট থেকে দুর্গের ধার পর্যন্ত ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ এবং বড়লোকদের অর্থাৎ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের বসতবাটী ছিল। দুর্গের পশ্চিম দিকে দুর্গের নিকটেই বড়ঠাকুরের বাড়ী এবং তার বাড়ীর পশ্চিমে ত্রিপুরীদের ঘর বাড়ী ছিল।

গোমতী নদীর অপর পাড়ে অর্থাৎ বাম পাড়ে পূর্বে পশ্চিমে একটি রাজপথের অবস্থিতির কথা দূতগণ উল্লেখ করেছেন। এই রাজপথের উপর নদীর ধারে ছিল বন্দর। নানা পশরায় ভরা দোকানে সজ্জিত ছিল বন্দরটি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেনাবেচায় বন্দর সরগরম থাকত। বঙ্গদেশের ব্যাপারীরা এই বন্দরে কেনাবেচা করত।[৩]

রাজপথের উত্তর পাশের নদীর ধারে ছিল যুবরাজ দুর্জয় সিংহের বাড়ী। তার বাড়ীর চতুর্দিক ইঁটের গড়ে ঘেরা। গড়ের ভেতরে ইঁটের তৈরী একটি চৌচালা ঘরে তার দরবার বসত। তার বাড়ীর পশ্চিম উত্তর কোণের দিকে একটি পথ চলে গেছল। এই পথের দুই পাশে বাঙালীদের ঘরবাড়ী ছিল। পথের দুপাশের গঞ্জ কেনা বেচাকরার কারবারীদের ঘর বাড়ী ছিল। রাস্তাটির প্রস্থ প্রায় দুই 'ডাব' হবে বলে দূতগণ অনুমান করেছেন। 'ডাব' নিশ্চয়ই দৈর্ঘ মাপার একক। কিন্তু 'ডাবের' প্রকৃত দৈর্ঘ না জানায় সঠিক প্রস্থ জানা যাচ্ছে না। এই পথে তিনটি বাজার বসত সেজন্য পথের প্রস্থ একেবারে গলির মত হবে বলে মনে হয় না।

রাজপথের দক্ষিণ পাশে চম্পকরায় যুবরাজের দীঘি ছিল। দীঘির গভীরতা প্রায় ছয় হাত হবে বলে দতগণ অনুমান করেছেন। উক্ত দীঘির পশ্চিম পাড়ে ইটের তৈরী দালান বাড়ী ছিল বলে দূতগণ লিখেছেন। কিন্তু বাড়ীটি কার তা তারা উল্লেখ করেন নি। চম্পকরায়ের দীঘির মাঝখানে আট হাত উঁচু ইটের ভিটের উপর আটটি খুঁটি দিয়ে টাঙান চাঁদোয়ার নীচে কাপড়ের তৈরী আসনে বসে রাজা ২য় রত্নমাণিক্য কালীয়দমন পালা দেখেছিলেন। সেখানে দর্শকরূপে দূতদেরও আমন্ত্রণ জানান

উদয়নগরীর মানচিত্র

হয়েছিল এবং তারাও ঐ পালা উপভোগ করেছিলেন। দীঘির চার পাড় ইট দিয়ে বাঁধান ছিল পাড়ে নানা রকম ফুল এবং নারিকেল, বেল, ডালিম ইত্যাদি ফলের গাছ রোপন করা হয়েছিল।[৮] বর্ণনা পড়ে অনুমান করা যাচ্ছে যে এরূপ মনোরম পরিবেশে দীঘির পাড়ের বাড়ীটি নিশ্চয়ই যুবরাজ চম্পকরায়ের বাড়ী। চম্পক রায় বোধ হয় রত্নমাণিক্যের কালে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজপুরুষ ছিলেন।

রাজপথের উত্তর পাশে প্রায় আধ মানুষ প্রস্থ ও পাঁচহাত উচ্চতা ইটের গড়ের ভেতরে ছিল একটি দেবস্থান। গড়ের ভেতরের জায়গাটি পাথর দিয়ে বাঁধান। গড়ের ভেতরে পূর্বদিকে প্রায় কুড়িহাত উঁচু পাথরের তৈরী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। বিষ্ণু মন্দিরের উত্তরে ছিল শিবের মন্দির। এই মন্দিরটিও পাথরের তৈরী প্রায় আঠার হাত উঁচু। মন্দিরের ভেতরে বৃষভবাহিত শিবের মূর্তি। আরও একটি পাথরের তৈরী মন্দির এই দেবস্থানে দূতগণ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাহল পাথরের তৈরী দশভূজা দুর্গার মন্দির। তিনটি মন্দিরেই রীতিমত সেবাপূজার ব্যবস্থা ছিল। রাজসরকার দ্বারা নিয়োজিত পূজারী ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন পূজা করে রাজাকে নির্মাল্য পাঠাত। পূজারীদের থাকার জন্য পাথরের তৈরী একটি ঘরও সেখানে ছিল। রাজার আদেশে পুরোহিতগণ সেখানে থেকে সেবাপূজা করত।[৫] দেবস্থানের উত্তর দিকে গোমতী নদী বাঁক নিয়েছিল। নদীর অপর পাড়ে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে ত্রিপুরীরা বাস করত।

রাজপথের দক্ষিণ পাশে ছিল অমরসাগর নামে দীঘি। দূতগণ দীঘির আয়তন তাদের রাজধানী রঙ্গপুরের দীঘির চেয়ে বড় বলে অনুমান করেছেন। অমরসাগরের পূবপাড়ে দুইজন ঠাকুর লোকের ইট, কাঠ ও বাঁশের তৈরী বাড়ী ছিল। উক্ত ঠাকুরগণ পদস্থ রাজপুরুষ কারণ তাদের বাড়ীতে প্রহরা, নাকাড়া ও নিশানের ব্যবস্থা ছিল। অমরসাগরের চারপাড়ে বাস করত নানা জাতের মানুষ। তাদের মধ্যে তাঁতী, সোনার, কামার, কুমোর, চর্মকার ছুতোর, ধোবা বারুই প্রভৃতি প্রধান। আর একটু পশ্চিমে একটু দূরে আরও একটি দীঘি বিজয় সাগরের অবস্থান কথা তারা উল্লেখ করেছেন।[৬] দীঘির আয়তন প্রসঙ্গে তারা তাদের দেশের তেলিয়াডোঙ্গার দীঘির সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং অনুমান করেছেন যে বিজয় মাণিক্য দ্বারা খনিত বিজয়সাগর আয়তনে তেলিয়া ডোঙ্গার দীঘির চেয়ে বড়। এই দীঘির চার পাড়ে নগরীর লোকেরা বাস করত। বিজয় সাগরের উত্তর পাড়ে যুবরাজ চম্পক রায়ের তৈরী একটি মন্দির ছিল। বিজয় সাগর ও অমর সাগরের মাঝের সমতল জমিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, দৈবজ্ঞ ও মালাকার প্রভৃতি বর্ণের লোকে বসবাস করত।

আরও পশ্চিমে রামমাণিক্য রাজার খনিত দীঘি রামসাগর। রামসাগরের প্রস্থ বিজয় সাগরের চেয়ে কিছু কম। রামসাগরের দক্ষিণ পাড়ে একটি ইটের তৈরী মন্দিরে সদাশিবের লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মণে রোজ সদাশিবের অর্চনা করত। দীঘির অন্য পাড়ে রাজপুরোহিত, সভাপণ্ডিত প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণদের ঘর বাড়ী ছিল। রামসাগরের দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটি রাস্তা জনপদে প্রবেশ করেছিল। দূতগণ যতদূর অবধি চোখে দেখতে পেয়েছেন তাতে অনুমান করেছেন যে রাস্তাটি প্রায়

একপ্রহরের হাটা পথ। রাস্তার দুই ধারে গ্রাম, গ্রামের লোকেরা গরু মোষ দিয়ে খেত খামারে কাজ করে তা দূতগণ প্রত্যক্ষ করেছেন।[৭] আরও দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল।

দূতগণ লিখেছেন যে রাজার নগরের দক্ষিণে একটি ইটের তৈরী মন্দির রয়েছে। মন্দিরটি প্রায় চল্লিশ হাত উঁচু হবে বলে তারা অনুমান করেছেন এবং লিখেছেন যে মন্দিরের ভেতরে "ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর" মূর্তি আছে।[৮] ত্রিপুরা বুরঞ্জীর বর্ণনা অনুসারে সেকালের রাজধানীর একটি মানচিত্র আমি তৈরী করেছি। এই বর্ণনার সঙ্গে বর্তমান উদয়পুরের বিভিন্ন স্থানের অবস্থানের বিশেষ মিল পাওয়া যাচ্ছে না। মিলের মধ্যে গোমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ে শহরের অবস্থিতি, বিজয় সাগর, অমর সাগর, রামসাগর প্রভৃতি নামই কেবল লক্ষ্য করা যায়। গোমতীর পূর্বধারে দুর্গের অবস্থিতি, রাজহাট, ওপারের শহর আর ডান পাড়ের অনেক স্মৃতিচিহ্ন যেমন চম্পকরায়ের দীঘি, দেবস্থান, রামসাগরের পাড়ের মন্দির প্রভৃতির কোন চিহ্নই বর্তমানে নেই। সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও জলাশয়গুলি কিছু কিছু বর্তমান আছে। দূতগণ সম্ভবতঃ পুরাণ দীঘিকে বিজয় সাগর বলে ভুল করেছেন কারণ অমরসাগরের পশ্চিমেই পুরাণ দীঘি অবস্থিত। 'ত্রিপুরা ঠাকুরাণী' নিশ্চয়ই দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী। কিন্তু ওখানে যাবার কোন পথ সম্ভবত ছিল না। জলাভূমি সুখসাগরের প্রসঙ্গ একেবারে বাদ পড়েছে। তাহলে কি ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে সুখসাগরের অস্তিত্ব ছিল না ?

—ঃ পাদটীকাঃ—

১। ত্রিপুরা বুরঞ্জী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩০।
২। তদেব, পৃঃ ৩০।
৩। তদেব, পৃঃ ৩১।
৪। তদেব, পৃঃ ৩২।
৫। তদেব, পৃঃ ৩২।
৬। তদেব, পৃঃ ৩২।
৭। তদেব পৃঃ ৩২।
৮। তদেব, পৃঃ ৩৪।

চতুর্থ অধ্যায়

ত্রিপুরার রাজবাড়ী

ত্রিপুরার রাজবাড়ীর চারিদিকে ইটের তৈরী প্রায় ৬ হাত উঁচু গড় ছিল। গড়ের প্রস্থ স্বর্গদেবের রঙ্গপুরের ভেতরের দুর্গের সমান হতে পারে বলে দূতগণ অনুমান করেছেন। দুর্গের সামনে ইটের তৈরী গড়ের সঙ্গে লাগিয়ে মাটি দিয়ে আরও একটি গড় তৈরী করা ছিল। মাটির গড়ের উচ্চতা ও ইটের গড়ের সমান। এই দুই গড়ের দূরত্ব সম্বন্ধে দূতগণ অনুমান করেছেন যে রঙ্গপুরের দারিবিয়াল দরজা থেকে বড় চারার মাথা পর্যন্ত দূরত্বের অর্দ্ধেক। তাদের এ বর্ণনা থেকে আমরা দুইটি গড়ের মাঝখানের দূরত্ব বিষয়ে বিশেষ ধারনা পাইনা। তবে দুটি গড় বেশ কিছু দূরে ছিল বুঝা যায়। ত্রিপুরার রাজবাড়ী প্রকৃতপক্ষে একটি দুর্গ।[১]

দুর্গের প্রবেশ মুখ ছিল দক্ষিণ দিকে। দুর্গের পশ্চিমে প্রবাহিত হত গোমতী নদী আর পূর্ব ও উত্তর দিকে ছিল ঢপলিয়া পর্ব্বত। দুর্গে ঢুকে প্রথম দূতদ্বয় একটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা কুঁজি (?) ঘর লক্ষ্য করেছেন। এই ঘরের দুইদিকে প্রায় পাঁচহাত উঁচু ইটের তৈরী ভিটা ছিল। ভিটার মাঝখানে জোড়া হাতী ঢুকতে পারে এরূপ প্রশস্ত পথ ছিল। এই ঘরের কোন দরজা ছিল না, ঘর দিনরাত খোলা থাকত। এই ঘরে চল্লিশ জন সেনা সহ একজন হাজারী মোতায়েন থাকত। তীর-ধনুক, গাদা বন্দুক, ঢাল-তরোয়াল প্রভৃতি অস্ত্র দূতগণ এই ঘরে দেখেছেন। এই ঘরের নাম রূপারদুয়ারী ঘর। আগে এই ঘরের দরজা রূপার পাতে মোড়া ছিল এবং ঘরের উপরে (সম্ভবতঃ চালায়) রূপার ঘট বসান ছিল। সেজন্যই ঘরের এরূপ নামাকরণ করা হয়েছিল।[২] রামমাণিক্যের আমলে এই ঘর আগুনে পুড়ে যায়। তারপর থেকে রূপার দরজা বা ঘট আর সেখানে ছিল না। দূতগণ রামমাণিক্যের পুত্র রত্নমাণিক্যের আমলে এই বাড়ী বা দুর্গ প্রত্যক্ষ করেন।

রূপার দুয়ারী ঘরের পূর্বদিকে প্রায় ৪ হাত ভেতরে ইটের তৈরী ভিটার উপরে একটি চৌচালা ঘর ছিল। এই ঘর দুর্গাবাড়ী। দুর্গা প্রতিমা গড়ে সেখানে পূজো করা হত। দুর্গা মন্দিরের নিকটে (কোন দিকে ?) প্রায় ৩০ হাত উঁচু আর একটি মন্দির ছিল। মন্দিরটি চৌচালা, ছন ও বাঁশের তৈরী। এই মন্দিরে দোলোৎসব হত। রূপার দুয়ারীঘরের পশ্চিমদিকে ইটের তৈরী প্রায় ২০ হাত উঁচু দুইটি মন্দির ছিল। একটি বিষ্ণু মন্দির ও অপরটি শিব মন্দির। বিষ্ণু ও শিব মন্দিরের সামনে ইটের ভিটের উপর ছন বাঁশের তৈরী একটি বেড়া বা দেয়ালহীন চৌচালা ঘর ছিল। ঘরের ভিটা হতে প্রায় ১ হাত উঁচু বাঁধান স্থান ছিল যাতে লোকেরা বেশ স্বচ্ছন্দে বসতে পারত। এই ঘরে আটজন ব্রাহ্মণ দিনরাত পালা কীর্তন করত। বিষ্ণুমন্দিরে পাথরের তৈরী লক্ষ্মী সরস্বতী সহ গোপীনাথ বিষ্ণুমূর্তি আর শিবের মন্দিরে পাথরের তৈরী

গণেশ-কার্তিকসহ; বৃষভবাহনে শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মণে নিয়মিত পূজা অর্চনা করে দুই মন্দিরের নির্মাল্য প্রতিদিন রাজাকে দিত।[৩]

রূপার দুয়ারী ঘর হতে কিছুদূরে আড়াআড়িভাবে কাঠ, ছন ও বাঁশের তৈরী একটি কুজি (?) ঘর দূতগণ লক্ষ্য করেছেন। এই ঘরের শাল কাঠের খুটির মাথায় কালকা-কেটে উপরে তুলে দেয়া হয়েছিল। পাইরের দুই মাথায় ঠাকুরার মুখ কেটে ঘোর রক্তবর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। এই ঘরে কাইম, কাঠি, রুয়া, পাট ও বেত সবই রক্তবর্ণ করে রাঙানো হয়েছিল। কাইমের উপর লম্বা শীতল পাটী বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে ছন দিয়ে ছানীর কাজ করা হয়েছিল। ঘরের উপরে অর্থাৎ চালায় একটি সোনার ঘট বসান ছিল। ঘরের মাঝখানে রাস্তা, রাস্তার দুধারে ৮ হাত পরিমাণ উঁচু ইটের ভিটা ছিল। এই ঘরের নাম সোনার দুয়ারী ঘর।[৪] এই ঘরের দুই ধারে ভিটের উপর পাটী পেতে, তার উপর গালিচা পেতে রাজপুরুষরা সভা করতেন। রাজা এই ঘরে বসতেন না। সোনার দুয়ারী ঘরের পূর্বদিকে একটি হাতীশালে রাজার ব্যবহারের জন্য দুইটি দাঁতাল ও দুইটি কুন্‌তি হাতী দূতগণ প্রত্যক্ষ করেছেন। সোনার দুয়ারী ঘরের পশ্চিমদিকে একটি ঘোড়াশালে আনুমাণিক একশত ঘোড়া দূতগণ দেখেছেন।

সোনার দুয়ারীঘর থেকে কিছুদূরে ভেতরের দুর্গের ইটের গড়ের কাছে কাঠ ও বাঁশের তৈরী একটি ঘর ছিল। ঘরের দেয়াল ইটের তৈরী এবং ঘরের ভিটাও ইটের তৈরী প্রায় সাত হাত উঁচু। প্রথম দিকে তিনটি কোঠার পর রাস্তার উপরে আড়াআড়িভাবে ইটের তৈরী দেয়াল, তার ভেতরে আরও দুটি কোঠা ছিল বলে দূতগণ উল্লেখ করেছেন। এই ঘরের সামনের দিকে দক্ষিণ দিক ধরে পশ্চিম অংশে সিড়ি কাটা একটি রাস্তা ছিল। ঘরের ভেতরের দিকে অন্দরমহল থেকে রাজার যাওয়া-আসা করার রাস্তা ছিল। প্রথম তিন কোঠার পরে ভেতরের দুই কোঠায় রাজার সেবক ভিন্ন অন্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কেবল মাত্র রাজাদেশ পেলে সেখানে যাওয়া যেত। সামনের তিন কোঠাতে খাট পেতে তার উপর রঙিন পাটী বিছিয়ে, পাটীর উপর গালিচা পাতা ছিল। গালিচার উপর সম্পূর্ণ হাতীর দাঁতের তৈরী একটি সিংহাসন সাজিয়ে রাখা ছিল রাজার বসার জন্য।[৫] সিংহাসনের উপর পাট কাপড়ের গদি দিয়ে তার উপর বনাত পাতা ছিল। বনাতের চারধারে সোনার ঝালর দিয়ে সিংহাসনের উপরে কিংখাবের বালিস রাখা হত। বালিসে রাজা বসতেন। ঘরের তিনটি কোঠাই একটি কার্পাসের তৈরী চাঁদোয়া দিয়ে সাজান, খুঁটিগুলি কার্মজের কাপড় দিয়ে মোড়া এবং সিংহাসনের উপরে চাঁদোয়া টাঙানো ছিল। চাঁদোয়ার মাঝখানে গোলাকৃতি সোনার কারুকাজ। এই ঘর সবসময়ে সাজান থাকত। এই ঘরের নাম সিংহাসন ঘর। ঘরের ভেতরের দুই কোঠাতে রাজার সেবকরা থাকত এবং রাজার জন্য পান সাজাত।

এই স্থান থেকে আরও ভেতরের দিকে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। রাজার আদেশ না জেনে কেউ সেখানে যেতে পারত না। সিংহাসন ঘরের পশ্চিমদিকে প্রায় দূরে ছিল খিড়কি-দুয়ার। তারপরে আর কোন ঘর ছিল না। নীচে গড় খাতের

ভূমির সামনে ছিল প্রধান দরজা। প্রধান দরজার পশ্চিম দিকে গড়ের কিনারায় ছিল একটি ঘোড়াশালে। রাজার ব্যবহারের জন্য দুইটি তুর্কী, ২টি তাজী, দুইটি মেখলী রাজার দেওয়া টাঙন ঘোড়া সেখানে দূতদ্বয় প্রত্যক্ষ করেছেন।

উক্ত প্রধান দরজা থেকে প্রায় ষোল হাত দূরে প্রায় এক হাত উঁচু ইটের তৈরী ভিটা সহ কাঠবাঁশের তৈরী একটি ঘর ছিল। ঘরের সামনে এক ফালি ফাঁকা জায়গা ইট দিয়ে বাঁধান। ঘর থেকে প্রায় চারহাত পাশ এক বিঘত (৯ ইঞ্চি) উঁচু একটি রাস্তা ফাঁকা জায়গাটিতে মিশে ছিল। এর মধ্যে প্রায় ১ হাত উঁচু গোলকার বসার আসন তৈরী করা ছিল। পুরো ঘরটা কার্পাস সূতার তৈরী চাঁদোয়ায় ঢাকা। ঘরের মেঝেতে ধারী পেতে, তার উপরে লালপাটী বিছিয়ে, পাটীর উপরে গালিচা পাতা হয়েছিল। গালিচার উপর সুজনি পেতে রাজা বসতেন। রাজার সুজনিটি একখণ্ড কাপড়ের উপর তুলো দিয়ে আস্ত ফুলের মত তৈরী করা। সুজনির চারধারে পানের আকৃতিতে মুড়ান এবং এবং ধারগুলি স্বর্ণখচিত। সুজনির উপরে চারটি ছোট ও একটি বড় বালিস পাতা থাকে। কোন কোন সময়ে রাজা ওখানে বসতেন। রাজা আদেশ দিলে কেউ সেখানে ঢুকতে পারত। সম্মানিত দূতদের একদিন ওখানে তলব করা হয়েছিল।[৬] রাজার অন্দর থেকে এই ঘরে আসার জন্য ইটের তৈরী একটি রাস্তা ছিল। ঘরের ঈশান কোণে ছিল একটি মন্দির। রাজা সেখানে পূজা অর্চনা করতেন।

সিংহাসনঘর থেকে বেরুন দীর্ঘ ইটের গড় পেছনের গড়ের সঙ্গে মিলেছিল।সেই গড়ের ভেতরে রাজার থাকবার জন্য ইটের ও ছন বাঁশের ঘর ছিল। ভেতরের দুর্গের গড়খাতের কিনারায় তাল ও নারিকেল গাছ ছিল। দুর্গের বাইরে পূর্বদিকে সোনার, রূপার ও অন্যান্য দ্রব্যের ভাণ্ডার ছিল। রাজার পাটেশ্বরীর ভাণ্ডার ও ছন বাঁশের তৈরী দশখানা ঘর দূতেরা দেখেছেন। ঘরগুলি গুদাম রূপে ব্যবহৃত হত। এই স্থানের পূবে আনুমানিক চারশত হাত দূরে দুইটি ইটের তৈরী কুঠুরী গোলাবারুদের গুদামরূপে ব্যবহৃত হত।[৭]

রাজবাড়ীর অন্দরমহলের বিবরণ বুরঞ্জীকারগণ দেননি। সম্ভবত তারা অন্দরমহলে প্রবেশ করার সুযোগ পাননি। বিশিষ্ট অতিথি রূপে তারা অন্দরের সামনে অবস্থিত রাজার বিশ্রামাগার পর্যন্ত আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাদের বিবরণী থেকে রূপারদুয়ারী ও সোনার দুয়ারী ঘরের প্রকৃত স্বরূপ ও অবস্থান জানা গেল রাজমালাতে উল্লেখ আছে যে–

"অন্তপুরে গেল যদি ত্রিপুরের রাজ।
সুবর্ণদ্বারেতে আসি বৈসে জুবরাজ॥
জগন্নাথ নারায়ণ আদি সর্ব্বজন।
শুবর্ণ দ্বারেতে বৈসে হরসিত মন॥"[৮]

কল্যাণ মাণিক্য বৃদ্ধ বয়সে রাজসভাতে ধর্মচর্চা করতেন। সভা শেষ করে রাজা অন্তপুরে চলে যাবার পর যুবরাজ গোবিন্দদেব ভাই জগন্নাথ দেব ও অন্যান্য পাত্রমিত্রদের নিয়ে সুবর্ণদ্বারে বসে অসমাপ্ত রাজকার্য সমাপ্ত করতেন। গোমতী নদী

বর্তমানে উদয়পুরে শহরের পাশের পশ্চিম বাহিনী। গোমতী নদীর উত্তর পাড়ে যে ভগ্ন রাজপ্রাসাদ রয়েছে তার সঙ্গে বুরঞ্জীকারদের বর্ণিত রাজগৃহের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ অবস্থা দৃষ্টে এটিই রাজধানী উদয়পুরের নবীনতম রাজপ্রাসাদ বলে মনে হয়। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় (বিশেষ করে মীর হাবিবের আক্রমণ থেকে শুরু করে) ত্রিপুরার ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। রাজক্ষমতা তখন এত দুর্বল হয়েছিল যে প্রাচীন প্রাসাদ পরিত্যাগ করে নতুন প্রাসাদ তৈরী করা তখন কার রাজন্যবর্গের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব এবং রাজমালাতেও ঐরূপ কোন নূতন প্রাসাদের উল্লেখ নেই। তাহলে একমাত্র সম্ভাব্য বিষয় হচ্ছে নদীর গতিপথ পরিবর্তন। হয়ত সেকালে নদী প্রাসাদের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে যেত। বর্তমানে গতি পরিবর্তিত হয়ে দক্ষিণ দিকে এসে গেছে।

—ঃ পাদটীকা ঃ—

১। সেন ত্রিপুর ঃ ত্রিপুরা দেশের কথা, আগরতলা ১৩৭২ বাং, পৃঃ ২৯
২। তদেব, পৃঃ ৩০।
৩। ত্রিপুরা বুরঞ্জী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৬।
৪। তদেব, পৃঃ ২৬।
৫। তদেব, পৃঃ ২৮।
৬। তদেব, পৃঃ ২৮-২৯।
৭। তদেব, পৃঃ ২৯।
৮। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৭৫।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজধানীর অর্থনৈতিক অবস্থা

রাজধানী উদয়পুর গোমতী নদীর দুই পাশে বিস্তৃত ছিল। গোমতী সেকালে ওখানে পশ্চিম বাহিনী ছিল বলে মনে হয়না। পশ্চিম বাহিনী হয়ে কিছুটা প্রবাহিত হবার পর ডান দিকে বেঁকে উত্তর বাহিনী হয়ে আবার বাঁক নিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হত বলে ধারণা করা যেতে পারে। নদীর ডান পাড়ে নগরের একাংশ অর্থাৎ রাজবাটী, রাজহাট সহ অন্যান্য বিপনি সারি ও বাজার। নদীর বামপাড়ে নগরের অপরাংশ বিস্তৃত ছিল। বুরঞ্জীকারগণ রাজবাড়ীর সামনে রাজহাট নামক বড় বাজারের উল্লেখ করেছেন। এই বাজারে কেনাবেচার প্রধান সামগ্রীর মধ্যে তামা, পিতল, হিঙ্গ, লবঙ্গ, জায়ফল, কাপড়, কার্পাস, লবণ, চিনি, বাতাসা দুধ, ঘি, সরিষা ও গুড়া হলুদের নাম তারা উল্লেখ করেছেন।[১]

নদীর বাম ধারে বেশ বড় বন্দর ছিল বলে বুরঞ্জীকার উল্লেখ করেছেন। বন্দরে তামা পিতল, কার্পাস, কাপড়, লবণ, তেল, ঘি ও অন্যান্য জিনিস কেনা বেচা হত। ব্যবসায়ীরা তাদের বিপণিতে (গুদামে ?) ধান, চাউল, ডাল, সরিসা ও তামাক পাতা সাজিয়ে রাখত। বন্দর বেশ জমজমাট ও কর্মব্যস্ত ছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে কেননা প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যেপর্যন্ত কেনাবেচা দূতগণ লক্ষ্য করেছেন। সমতল বঙ্গদেশের ব্যাপারীরা কাপড় ও নানারকম বনজবস্তু কিনত। যুবরাজ দুর্জয় সিংহের বাড়ীতে যাবার পথে আরও তিনটি বাজার ও দূতগণের নজর এড়াতে পারেনি।

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে তারা আম, কাঁঠাল, বেল, নারিকেল, তাল ইত্যাদি ফলের বৃক্ষ রাজবাড়ীর পূব দিকে অবস্থিত ঢপলিয়া পর্ব্বতে বসবাসকারী ত্রিপুরী লোকেদের বাড়ীতে দেখেছেন। পাহাড়ে অর্থাৎ জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চভূমিতে আদা তরমুজ, ধান, কার্পাস, কচু, কুমড়া, আলু, কনীধান ইত্যাদি ফলতে দেখেছেন। শহরে নাগরিকদের প্রত্যেকের বাড়ীতে দুই চারটি করে তাল, নারিকেল, বেল গাছ তাদের চোখে পড়েছে। গ্রামের দিকে সমতল জমিতে গরুমোষ দিয়ে চাষ করা শস্যক্ষেত্র এবং কৃষকরা কিভাবে চাষাবাদ করছে তার বর্ণনা ও আমার পাই।[২]

অমর সাগর দীঘির পাড়ে বিভিন্ন রকমের কুটির শিল্পীদের ঘরবাড়ী ছিল। এদের মধ্যে তাঁতী, কুমোর, কামার, চর্মকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার, বারুই, মালাকার ইত্যাদির কথা তারা উল্লেখ করেছেন। রাজধানীর প্রধান রাজপথে ও বাজারগুলিতে এসব কারিগরদের দোকান ও দূতগণের নজর এড়াতে পারেনি।[৩]

এই বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে রাজধানীর অর্থনীতি প্রধানত দুইটি ধারার উপর নির্ভরশীল ছিল। একটি কৃষিভিত্তিক এবং অপরটি শিল্পভিত্তিক। কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, কার্পাস, সরিষা ও তামাক পাতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধান সমতল জমি ও পাহাড়ী উচ্চ ভূমিতে চাষ করা

হত। কার্পাস, সরিষা সম্ভবতঃ কেবলমাত্র পার্বত্য জমিতেই চাষ করা হত। প্রতি বাড়ীতে কিছু কিছু ফলের চাষ হত। শিল্প বলতে খুব সম্ভবত কুটির শিল্পই বেশ প্রসার লাভ করেছিল এবং উপযুক্ত শিল্পীরও অভাব ছিল না। তামা ও পিতলের কাজ বেশ ভাল ভাবে হত এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বাসন পত্র তৈরী হত।

কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী কেবলমাত্র স্থানীয় বাজারেই বিক্রী হতনা। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে সমতল বঙ্গদেশে রপ্তানী করা হত। কার্পাস, ধান, বিভিন্ন বনজ বস্তু ও শাকসব্জী রপ্তানীর প্রধান দ্রব্য ছিল। এছাড়া আদা, হলুদ, লঙ্কা ও সরিষাও রপ্তানীযোগ্য পণ্য ছিল। কাপড়, লবণ ও অন্যান্য মসলা আমদানী করা হত। আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে উদয়পুর বন্দর বিশেষ ভূমিকা পালন করত। বন্দরটি বেশ জমজমাট ও কর্মব্যস্ত ছিল বলে দূতগণ উল্লেখ করেছেন। বিবরণী থেকে অনুমান করা যায় যে অধিবাসীদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। কিন্তু দূতগণ আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ দ্রব্যমূল্যতালিকা ইত্যাদি সম্বন্ধ কোন ইঙ্গিত বিবরণীতে দেননি। আসাম রাজের দূতগণের ত্রিপুরা ত্যাগের (১৭১৫ খৃঃ) কয়েকবৎসর পরে মীরহাবিব ত্রিপুরা আক্রমণ করেন (১৭২৯ খৃঃ) এবং রাজধানী লুটপাট করে প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে যান।[৪] মীরহাবিবের ধনসম্পদ প্রাপ্তি নগরীর লোকেদের সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার প্রমাণ এবং ত্রিপুরা বুরঞ্জীতে লিখিত বিবরণীর প্রামাণ্যতার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

—ঃ পাদটীকাঃ—

১। সেন ত্রিপুর ঃ ত্রিপুরা দেশের কথা, আগরতলা, ১৩২৭২ রাং, পৃঃ ৩৪

২। তদেব, পৃঃ ৩৫।

৩। তদেব, পৃঃ ৩৭।

৪। স্যার যদুনাথ ঃ দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, মুসলিম পিরিয়ড, পাটনা, ১৯৭৭ ইং, ঃ ৪২৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা

সেকালে সামরিক প্রয়োজনে রাস্তা তৈরী হত। প্রজাদের গমনাগমন বাড়তি লাভ, অবশ্য পথের দুর্গমতার জন্য লোকজন বিনা প্রহরায় বেশী দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করত না। রাজধানীর সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য নিশ্চয়ই পথ ছিল। পথগুলি পদাতিক, অশ্বারোহী বা হাতীর পিঠে চড়ে চলার উপযোগী মেটে রাস্তা হওয়াই স্বাভাবিক। এরূপ রাস্তার সন্ধান আমরা রাজমালা, গাজীনামা এবং অন্যান্য সমসাময়িক গ্রন্থাদি থেকে পাই। লোক গাঁথাতেও অনেক জাঙ্গালের নাম পাওয়া যায়। ঐসব জাঙ্গালের অস্তিত্ব রাজমালার বিবরণীর সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

নাজিরের জাঙ্গাল ঃ

মহারাজ রত্নমাণিক্য গৌড়ের সৈন্য নিয়ে যে পথে রাজধানী আক্রমণ করেছিলেন তার বিশদ বিবরণ রাজমালাগুলিতে নেই। খুব সংক্ষেপে এই অভিযানে বিবরণ লেখা হয়েছে। শ্রী রাজমালার মতে–

"রত্ন ফা চলিল নিজ রাজ্য লইবারে।
কতদিনে আসিলেক জামির খাঁর গড়ে॥
গড় জিনি রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া লইল।
ডাঙ্গর ফার সৈন্যসব পর্ব্বতেতে গেল॥"[১]

জামির খাঁন গড় বর্তমানের বাগমা বলে শ্রীরাজমালা সম্পাদক সিদ্ধান্তে এসেছেন।[২] তাহলে খুব সম্ভবতঃ কৈলাগড়, বিশালগড়, জামির খাঁর গড় দিয়ে যে পথ ছিল সে পথেই রত্নমাণিক্য রাজধানী রাঙামাটি দখল করেন। শ্রী রাজমালা সম্পাদক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন–"অতঃপর রাজপরিবার মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলেই দুর্ব্বল পক্ষ রত্নফার প্রদর্শিত সুগমপথ অনুসরণ করে, গৌড়ের সাহায্য লইয়া রাজ্যমধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিতেন।[৩]" শ্রী রাজমালা সম্পাদকের কথিত "সুগম" পথেই পরবর্তীকালে সরাইলের পথে আগুয়ান হৈতান খাঁর নিকট পরাজিত ত্রিপুর-বাহিনী ক্রমাগত কৈলাগড়, বিশালগড়, জামির খাঁর গড়, ছকড়িয়াগড়, যসপুর হয়ে রাঙামাটিতে পশ্চাদাপসরণ করে। এখানে আমরা একটি প্রাচীন রাস্তার রূপরেখা পাই। এই রাস্তার সঙ্গে বর্তমানের উদয়পুর-বিশালগড় তথা আগরতলা সড়কের গতি পথের বেশ মিল দেখা যায়। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেও এই পুরাতন রাস্তার চিহ্ন ছিল। "পুরাতন রাস্তার চিহ্ন এই দিকে এখনও যথেষ্ট বিদ্যমান আছে; ইহার নাম নাজিরের জাঙ্গাল। উদয়পুর হইতে বিশালগড়ের দূরত্ব ২২/২৩ মাইল হইবে।[৪]" এই পথেই ইস্পিন্দার খাঁর মোগল বাহিনী ১৬২১ খৃষ্টাব্দে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছিল।

২য় ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে ১৭২৯ খৃঃ মীরহাবীবের একটি বাহিনী এই পথ ধরে এত দ্রুত রাজধানীতে উপস্থিত হয় যে হতচকিত ধর্মমাণিক্যের পলায়ন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

গাজীর জাঙ্গাল ঃ

মেহেরকুল–উদয়পুর রাস্তা সেকালের একটি প্রধান পথ। ধন্য মাণিক্যের রাজত্বকালে গৌড় সেনাপতি গোরাই মালিক মেহেরকুল দুর্গ অধিকারের পর এই পথ ধরে সোনামাটিয়া দখল করে চণ্ডীগড় পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। সোনামাটিয়া বা সাভারগড় বর্তমানের সোনামুড়া। যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে মোগল সেনাপতি মির্জানুরুল্লা এই পথেই উদয়পুর পৌঁছেছিলেন। ২য় ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে মীরহাবীব এই পথেই চণ্ডিগড় বিধ্বস্ত করে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হন। পরবর্তীকালে সমসের গাজী এই পথেই সোনামুড়ার নিকটবর্তী গাজীর কোট নামক স্থান দিয়ে উদয়পুর আক্রমণ করেছিলেন বলে প্রবাদ প্রচলিত আছে। দেওপুষ্করিণীর নিকটবর্তী স্থানে পুরাতন রাস্তার যে চিহ্ন আছে, তাহাকে লোকে 'গাজীর জাঙ্গাল' বলে।"[৫] "কুমিল্লা হইতে বিবির বাজার, ভোগজার, কটকবাজার, বড়পাথর, চুন্দলবাড়ী, রাণীবাড়ী, চান্দিনামুড়া, চন্দ্রপুর হইয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর বাড়ী এবং তৎপর উদয়পুর পর্যন্ত যাতায়াতের একটি পুরাতন রাস্তা গোমতী নদীর পশ্চিম ও দক্ষিণপাড় দিয়া পূর্বে ছিল বলে জানা যায়। স্থানে স্থানে এই পুরাতন রাস্তার চিহ্ন ও পাওয়া যায় কিন্তু এই পথে এখন জনসাধারণ চলাফিরা করে না।"[৬]

রাজার জাঙ্গাল ঃ

শ্রীহট্টের দিক হতে একটি রাস্তা মণতলা পরগণার পশ্চিমসীমা দিয়ে সদর মহকুমার মোহনপুর তহশীলের ফকীরপুড়া, তারানগর মৌজার মধ্য দিয়ে বিশালগড় হয়ে উদয়পুরে যাবার পুরাতন চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখা যায়। এই রাস্তা রাজার জাঙ্গাল নামে পরিচিত ছিল। শ্রীহট্ট থেকে আখাউড়া পর্যন্ত রেলপথ স্থানে স্থানে এই জাঙ্গালের উপর দিয়েই তৈরী করা হয়েছে।[৭]

উদয়পুর-আচরঙ্গ পথ ঃ

যশোধর মণিক্যের রাজত্বকালে মোগল আক্রমণের ডামাডোলে সেনাপতি রণজিৎ ত্রিপুরার আচরঙ্গ প্রদেশ স্বাধীন নৃপতিরূপে শাসন শুরু করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ত্রিপুরার আধিপত্য অস্বীকার করেন। কল্যাণমাণিক্য লক্ষ্মীনারায়ণকে শাসন করার জন্য স্বীয় পুত্র গোবিন্দদেবকে আদেশ দেন। গোবিন্দ দেব পদাতিক, অশ্বারোহী ও গজবাহিনী নিয়ে আচরঙ্গ অভিযান করেন। সৈন্য চলাচলের উপযোগী পথ না থাকার ফলে বাধ্য হয়ে সেনাপতি গোবিন্দদেব পার্বত্যভূমির জঙ্গল পরিস্কার করে পথ তৈরী করতে করতে অভিযান পরিচালনা করেন। রাজমালার মতে–

"এহিমতে সন্য সঙ্গে রাজপুত মনুরঙ্গে
আচরঙ্গে জায় উদ্ধেসিয়া ।
গিরি নদি গুহা জত লংঘিয়া রাজার সুত
পথ করে পর্ব্বত কাটিয়া ॥
উৎস নিচ্চ সম করি লংঘীয়া বহুল গিরি
ধারে ধারে জায়ে সেনাগণ ।৮" ইত্যাদি

এভাবে পথ তৈরী করতে করতে গোবিন্দদেব আচরঙ্গে পৌঁছান এবং লক্ষ্মীনারায়ণকে পরাস্ত ও বন্দীকরে এই পথেই রাজধানী উদয়পুরে ফিরে আসেন ।

রাংরুঙ্গ-উদয়পুর পথঃ

আর একটি পথের বিবরণ আমরা ত্রিপুরা বুরঞ্জী থেকে পাই । আসামের রাজা স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের দূতগণ মোট তিনবার উদয়পুরে যাতায়াত কপরেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে দূতগণ ৩৪ জন অনুচর সহ ত্রিপুরার দূত রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের নেতৃত্বে নামভঙ্গ থেকে নৌকা যোগে ও পদব্রজে কাছারের রাজধানী খাসপুরে পৌঁছান । খাসপুর থেকে তারা উদয়পুরে আসেন । তাদের পথে রাংরুঙ্গ, তৈজাল পাড়া, কুমজাঙ্গ, সাইরেঙ্গ চুক, দেওগাঙ্গ, ছোট মরিছড়ি, বড় মরিছড়ি এবং খাকরাই নামক স্থান পড়েছিল । খাকরাই থেকে ত্রিপুরার রাজার আদেশ অনুসারে ত্রিপুরার রাজার পাঠান ঘোড়ায় চেপে তারা রাজধানী উদয়পুরে প্রবেশ করেছিলেন । বিবরণীর মতে রাংরুঙ্গ ত্রিপুরা, কাছাড় ও মণিপুর সীমান্তে অবস্থিত ত্রিপুরার একটি থানা । সেখানে একজন লস্কর নিযুক্ত ছিলেন৯ । এই পথ কিরূপ ছিল অর্থাৎ পুরাণ পথ কিনা তা অবশ্য বিবরণী থেকে জানা যায় না তবে দূতগণ লিখেছেন খাকরাই থেকে রাজার নগরী পর্যন্ত ৪ দণ্ডের পথ তাঁরা অশ্বারোহণে এসেছিলেন । দূতদের খাকরহিতে বিশ্রাম করার পরামর্শ দিয়ে রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার রাজধানীতে পৌঁছান এবং দূতগণের আগমণ বার্তা রাজ-গোচরে আনেন । তখন রাজা ঘোড়া পাঠান এবং দূতগণ রাজধানীতে আসেন । সেজন্য খাকরাই থেকে রাজনগর পর্যন্ত পথ অন্ততঃ অশ্বারোহণ যোগ্য ছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে ।

মহেশ পুষ্করিণী—উদয়পুর পথঃ

বিলোনিয়ার দিক থেকে সমসের গাজী দুইবার উদয়পুর আক্রমণ করেছিলেন । মহেশ পুষ্করিণী থেকে উদয়পুর পর্যন্ত রাস্তা ছিল । সোনাতলা পাথর, মুণ্ডমালা, গাস্তারী কিল্লা প্রভৃতি প্রাচীন স্থানের মধ্য দিয়ে এই পথ সে কালের রাজধানীতে প্রবেশ করেছিল । গাজীনামার মতে মহেশ পুষ্করিণী পথেই রাজকীয় বাহিনী পরাস্ত করে সমসের উদয়পুরে প্রবেশ করেছিলেন ১০। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে সমসের এই পথে আক্রমণ করে রাজধানী দখল করতে পারেননি । কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে এই পথ রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ও দক্ষিণাঞ্চলের শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ।

উদয়পুর-কাকড়াবন পথঃ—

উদয়পুরের পশ্চিমদিকে গোয়াল গাঁও একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। অমরমাণিক্য নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"জসপুর হতে আমী গোয়ালগ্রাম আসি।
সন্দার সময় তাথে ভয় নাহি বাসি ॥১১"

উক্ত গোয়ালগাঁও এর ভিতর দিয়ে উদয়পুর হতে একটি পথ টেপানিয়া, হদ্রা, শালপড়া আমতলী হয়ে কাকড়াবন পর্যন্ত গিয়েছিল। এই রাস্তা 'গোয়ালিনীর জঙ্গাল" বলে জন সমাজে কথিত ছিল। এই রাস্তার চিহ্ন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেও উদয়পুর বিবরণীর লেখক দেখেছেন।

উদয়পুর—অমরপুরপথঃ

উদয়পুর হতে ফুলকুমারী, হীরাপুর, মহারাণী হয়ে অমরপুর পর্যন্ত পায়ে হাটার রাস্তা কিছুকাল আগেও বিদ্যমান ছিল। এখন নূতন মোটর সড়ক চালু হওয়াতে প্রাচীন পথের গুরুত্ব কমে নিয়েছে। অমরমাণিক্য অমরপুরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সে রাজধানীতে যাবার পথ হিসেবে সম্ভবত সেকালে এপথের ব্যবহার ছিল।

মেহেরকুল—উদয়পুর নদীপথঃ—

গোমতী নদী পথে সমতল বঙ্গদেশের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ছিল। ত্রিপুরা বুরঞ্জীতে উদয়পুর বন্দরের উল্লেখ আছে। যুদ্ধের প্রয়োজনেও গোমতী নদীপথ ব্যবহার করা হত। বিজয় মাণিক্য (২য়) নৌবহর নিয়ে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন। গোরাই মালিক নদীপথের ব্যবহার করেছিলেন। যশোধরমাণিক্যের রাজত্বকালে মোগল আক্রমণের সময়ে মোগল নৌ সেনাপতি বাহাদুর খাঁ তার নৌবহর নিয়ে গোমতী নদী পথে রাজধানী উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হন এবং নৌযুদ্ধে ত্রিপুরার নৌবহর বিধ্বস্ত হয়।১২ এসব অভিযান প্রমাণ করে যে গোমতীর নাব্যতা সেকালে অনেক বেশী ছিল বলেই নদীপথে নৌবহর চলতে পারত। প্রকৃতপক্ষে ৩০-৩৫ বৎসর পূর্বেও গহনার নৌকা বর্ষাকালে কুমিল্লা থেকে উদয়পুর পর্যন্ত রীতিমত যাতায়াত করত। নদীর নাব্যতা কমে যাবার ফলে নৌচলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হল এবং নতুন সড়কপথের উন্নতির ফলে নদীপথের ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

আলোচ্য পথগুলি দিয়েই সম্ভবতঃ মধ্যযুগে রাজধানী উদয়পুরের সঙ্গে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করা হত। পরবর্তীকালে (১৭৬০ খৃঃ) রাজধানী পরিত্যক্ত হওয়াতে রাজপথগুলির ব্যবহার কমে গেল এবং লোকচলাচল বিবর্জিত হয়ে ক্রমশঃ অরণ্যের অধিকারে চলে গেছে। রাজধানী স্থানান্তর হওয়ার ফলে প্রাচীন রাজধানীর লোকসংখ্যা কমে গেল এবং ব্যবসা বাণিজ্যে ভাটা পড়ল, পথের প্রয়োজনও সীমিত হয়ে গেল। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে বর্তমান কালে যে সব সড়ক নূতন রাজধানীর সঙ্গে প্রাচীন রাজধানীর বা প্রাচীন রাজধানীর সঙ্গে সীমান্তবর্তী শহরের

যোগাযোগ স্থাপন করছে, সেগুলি হয় প্রাচীন পথের উপর দিয়েই তৈরী হয়েছে বা প্রাচীন পথের পাশেই তৈরী হয়েছে।

—ঃ পাদটীকা ঃ—

১। শ্রীরাজমালা, প্রথম লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬৬।
২। তদেব ঃ মধ্যমণি, পৃঃ ২৮০।
৩। তদেব ঃ মধ্যমণি, পৃঃ ১৮৯।
৪। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬১।
৫। তদেব ঃ পৃঃ ৬১।
৬। তদেব ঃ পৃঃ ৬২।
৭। তদেব ঃ পৃঃ ৬৮।
৮। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৭২।
৯। ত্রিপুরা, বুরঞ্জী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২১-২৪।
১০। শেখ মনোহর ঃ গাজীমালা (হস্তলিখিত), পৃঃ ৪৯, ৫৪, (পরে গাজীমালা)। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সংগৃহিত কপি থেকে সংগৃহিত।
১১। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫৪।
১২। স্যার যদুনাথ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩০১-৩০২।

সপ্তম অধ্যায়

রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

পার্বত্য ত্রিপুরার প্রায় মাঝখানে রাজধানী স্থাপন করে বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে রাজধানী বাঁচাবার জন্য ত্রিপুর- রাজগণ নানাহানে দুর্গ ও সেনানিবাস স্থাপন করে রাজধানী সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন । শ্রী রাজমালা সম্পাদকের মতে রাজধানীর সন্নিহিত চতুস্পার্শে দুর্গগুলি অবস্থিত ছিল[১] ।" সেকালে দুর্গকে গড় বলা হত । রাজমালাতে মেহেরকুল, চণ্ডীগড়, কৈলার গড়, বিশাল গড়, গামরিয়া গড়, সংরাইশ গড়, কল্মিগড়, যশপুর গড়, তারপাধুম গড়, জামির খান গড়, সোনামাটিয়া গড়, মহেশ পুষ্করিণী ইত্যাদির উল্লেখ আছে । আমরা এই গড়গুলির বর্তমান অবস্থান, ইতিহাস এবং চিহ্নিত স্থানে সেনানিবাসের কোন অস্তিত্ব পাই কিনা তা পরীক্ষা করে দেখছি । বর্তমান ত্রিপুরার মানচিত্রে চিহ্নিত গড়গুলির অবস্থান নির্দেশ করলে আমরা রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি চিত্র পাব । কিন্তু যুদ্ধোদ্যোগ ও সৈন্যচলাচল সেকালের রাস্তাঘাটের পরিপ্রক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে ।

কৈলার গড়ঃ

আগরতলা থেকে প্রায় ২৫ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে প্রসিদ্ধ কমলাসাগর দীঘি ও কসবার দুর্গাবাড়ী অবস্থিত । এই দুর্গা বাড়ী প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন দুর্গমধ্যে অবস্থিত হলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন ।[২] বর্তমানে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বলতে কিছুই নেই তবে চারিদিকে ইটের টুকরা ছড়িয়ে আছে । উচ্চভূমিতে এখনও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ঘাঁটি প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখছে । কসবার প্রাচীন নাম কৈলার গড় বা কৈলা গড় । ধন্যমাণিক্যের আমলে কৈলাগড়ে হৈতান খাঁর বাহিনীর হাতে ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগের পরাজয় ঘটে । রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৫৮৬–১৫৯৯ খৃঃ) এখানে ত্রিপুরবাহিনী চন্দ্রদর্প নারায়ণের নেতৃত্বে গৌড় বাহিনী প্রতিহত করে । কল্যাণ মাণিক্যের মাতামহ রণদুর্লভ নারায়ণ কৈলাগড়ের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন । যশোমাণিক্যের রাজত্বকালে কল্যাণদেব নিজে কৈলাগড় দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং এখানেই ইস্পিন্দার খাঁর মোগলবাহিনীর নিকট ত্রিপুর-বাহিনী পরাস্ত হয় । কল্যাণ মাণিক্য কৈলাগড় দুর্গে ১৬৫৮ খৃঃ শাহ সুজার মোগল বাহিনী প্রতিহত করেন ।

বিশাল গড় ঃ

আগরতলা-উদয়পুর সড়ক পথে আগরতলা থেকে প্রায় ১৯ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত বিশালগড় বর্তমানে একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র । সেনা নিবাস ও দুর্গ হিসেবে বিশালগড়ের উল্লেখ রাজমালাতে আছে । কিন্তু বর্তমানে বিশালগড়ের আশে পাশে

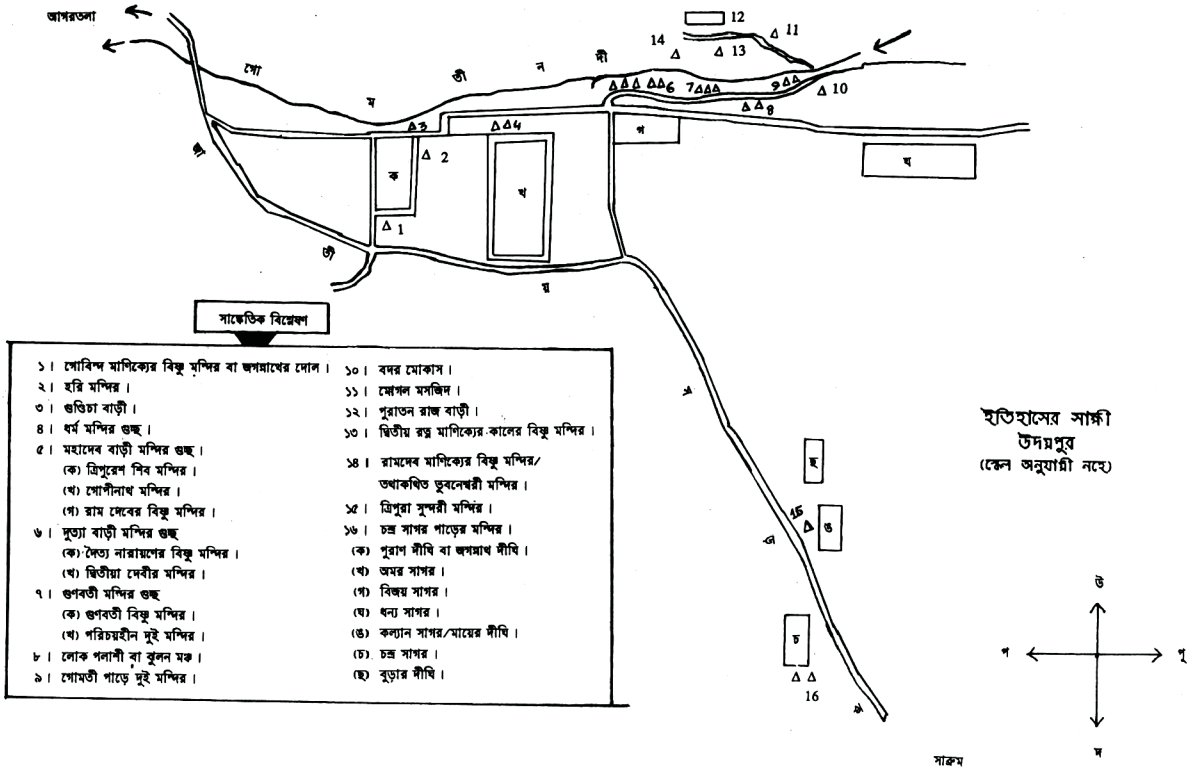

সাঙ্কেতিক বিশ্লেষণ

১। গোবিন্দ মাণিক্যের বিষ্ণু মন্দির বা জগন্নাথের দোল।
২। হরি মন্দির।
৩। গুণ্ডিচা বাড়ী।
৪। ধর্ম মন্দির গুচ্ছ।
৫। মহাদেব বাড়ী মন্দির গুচ্ছ।
(ক) ত্রিপুরেশ শিব মন্দির।
(খ) গোপীনাথ মন্দির।
(গ) রাম দেবের বিষ্ণু মন্দির।
৬। দুত্যা বাড়ী মন্দির গুচ্ছ
(ক) দৈত্য নারায়ণের বিষ্ণু মন্দির।
(খ) দ্বিতীয়া দেবীর মন্দির।
৭। গুণবতী মন্দির গুচ্ছ
(ক) গুণবতী বিষ্ণু মন্দির।
(খ) পরিচয়হীন দুই মন্দির।
৮। লোক পলাশী বা ঝুলন মঞ্চ।
৯। গোমতী পাড়ে দুই মন্দির।
১০। বদর মোকাম।
১১। মোগল মসজিদ।
১২। পুরাতন রাজ বাড়ী।
১৩। দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যের কালের বিষ্ণু মন্দির।
১৪। রামদেব মাণিক্যের বিষ্ণু মন্দির/
তথাকথিত ভুবনেশ্বরী মন্দির।
১৫। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির।
১৬। চন্দ্র সাগর পাড়ের মন্দির।
(ক) পুরাণ দীঘি বা জগন্নাথ দীঘি।
(খ) অমর সাগর।
(গ) বিজয় সাগর।
(ঘ) ধন্য সাগর।
(ঙ) কল্যান সাগর/মায়ের দীঘি।
(চ) চন্দ্র সাগর।
(ছ) বুড়ার দীঘি।

কোন ধ্বংসস্তূপ নেই। বিশালগড় প্রথমে দখল করেন জুঝার ফা (৫৯০ খৃঃ)। ধন্যমাণিক্যের আমলে বিশালগড়ের দুর্গাধ্যক্ষ পাঠান সেনাপতি হৈতান খাঁর নিকট পরাস্ত হন এবং পশ্চাদাপসরণ করেন।

জামির খাঁ গড়ঃ

আধুনিক বাগমা হচ্ছে মধ্যযুগীয় জামির খাঁ গড়। বাগমা বিশ্রামগঞ্জ ও উদয়পুরের মাঝামাঝি আগরতলা–উদয়পুর সড়কে অবস্থিত একটি জনপদ। এই স্থানে প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ রূপে দুর্গের প্রাচীর ও পরিখার চিহ্ন পাওয়া গেছে। ইটের প্রাচীরের প্রস্থ প্রায় ১০ ফুট। ইটে ১৪৪১ অঙ্ক শ্রী রাজমালা সম্পাদক লক্ষ্য করেছিলেন[৩]। ১৪৪১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে, ধন্যমাণিক্যের রাজত্বকাল ঘোষণা করছে। ধন্যমাণিক্যের আমলে জামির খাঁর অধ্যক্ষ ছিলেন খড়্গ রায়। তাকে পরাস্ত করে হৈতান খাঁন জামির খাঁ দখল করেছিলেন।

ছয়ঘড়িয়া ঃ

চড়িলাম মৌজার দক্ষিণ দিকে ছয়ঘরিয়া নামে একটি প্রাচীন বস্তি আছে। এখানে পূর্বে মরছুম সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা বাস করত। এখানে একটি টিলার উপর চতুষ্কোণ বিশিষ্ট বেশ লম্বা তিনটি গৃহের ভিত্তি চিহ্ন শ্রীরাজমালা সম্পাদক লক্ষ্য করেছেন। এই সব ভিত্তি চিহ্ন সেনা নিবাসের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। ধন্যমাণিক্যের আমলে ছয়ঘরিয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন গগণ খাঁ নামে এক সেনাপতি। পাঠান সেনাপতি হৈতান খাঁ এই দুর্গ অবরোধ করলে গগণ খাঁ নয় ঘন্টা পর্যন্ত লড়াই করে পরাস্ত হন ও পশ্চাদপসরণ করেন।

তারপাধূমঃ–

উদয়পুরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রাম। বর্তমানে কাকড়াবন তুলা মুড়া পথের পাশে অবস্থিত এই গ্রামের প্রাচীন নাম ডোম ঘাটি। এখানে জলাশয়, মাটির গড়ের চিহ্ন রয়েছে। উদয়পুর-খণ্ডল পথ এই স্থানের উপর দিয়েই নির্মাণ করিয়েছিলেন সমসের গাজী।

গামারিয়াঃ

উদয়পুরের দক্ষিণ দিকে তিক্ষা পাহাড়ের উপর গামারিয়া কিল্লার অবস্থান নির্ণয় করেছেন শ্রীরাজামালা সম্পাদক। "উদয়পুর হইতে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত সে রাস্তার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, গামারিয়া কিল্লা সেই রাস্তার উপর তিক্ষা পর্বতের শৃঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল[৪]।" চম্পক বিজয় গ্রন্থে গামারিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। নরেন্দ্র মাণিক্য সেনাপতিকে উপদেশ দিচ্ছেন–

"দক্ষিণ দিকে তুমি হৈলা সেনাপতি।
দক্ষিণের গড় যত তোমার যাবতি॥

চৌদ্দ গ্রামের গড় ধরিয়া সাবহিতে ।
ভাল যত্নে গড় যে রাখিবা মহামতে ॥
কোন পাকে আসি যদি লয় সেই গড় ।
গামারিয়া গড়ে আসি উঠিও সত্বর ॥
গামারিয়া গড়ের পথ বড়হি দুর্গম ।
এক হাত পাশ পথ চলিতে বিষম ॥
আকাশ সমান মুড়া দেখিতে ভয় করে ।
আছুক উঠিব দেখি মুণ্ডে ঘাত পড়ে ॥"

গামারিয়া গড়ের দুর্গমতা কবিতাটিতে বেশ সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে । তিফ্রা পরগণার সমতলভূমি চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও পার্বত্য অঞ্চল পার্বত্য রাজ্যের সীমার মধ্যে ছিল । কল্যাণ মাণিক্যের মাতুল গামারিয়া দুর্গের সিকদার ছিলেন । বালক কল্যাণদেবকে নিয়ে তাঁর মা সেখানে গুপ্তভাবে বাস করেছিলেন । রাজমালা বর্ণনা দিচ্ছে–

"ই কথা শুনিয়া তবে কল্যাণের মাতা ।
তাহাকে রাখিল নিয়া তান ভ্রাতি জথা ॥
গামারিয়া ঘাটেত তাহার অবহিতি ।
সিকদারী করিছে সেই সেখনে প্রতিনিতি ॥
কল্যাণের মাতুল ছিল সেখানে প্রধান ।
তার কিছু নিতি বলি কর অবধান ॥[৫]"

কলমি গড়ঃ

উদয়পুর থেকে খণ্ডলগামী প্রাচীন রাস্তার পাশে এই দুর্গ থাকবার সূত্র রাজমালাতে পাওয়া যায় । বর্তমান সোনামুড়া শহরের দক্ষিণ দিকে "দুধ পুষ্করিণীর" পশ্চিম পাশে বিস্তৃত স্থানে ইটের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় । এই ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণ পশ্চিমকোণে মাটির প্রাচীর ও পরিখার চিহ্ন দেখে শ্রী রাজমালা সম্পাদক এই স্থানটি প্রাচীন কলমিগড় বলে অনুমান করেছেন ৬ । শ্রীরাজমালাতে দেখা যায় যে অমরদেব উদয়মাণিক্যের রাজত্বকালে মেহেরকুল দুর্গের অধিপতি ছিলেন । তারপর তাকে কলমি গড়ে স্থানান্তর করা হয়–

'মেহারকুল গড় ছাড়িছি তৎপর ।
কলমি গড়ে সৈন্য সমে ছিলাম তদন্তর ॥[৭]"

সংরাইশ গড়ঃ

কুমিল্লা শহরের পূবপাশে জগন্নাথপুরের উত্তর দিকে সংরাইশ নামে একটি গ্রাম রয়েছে । জগন্নাথপুর সতেররতন মন্দিরের জন্য বিখ্যাত । মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য এই সতের রতন নির্মাণ করান । পার্শবর্তী সংরাইশ গ্রামটি গোমতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত । নদীর উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য এখানে গড় থাকার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায়না কিন্তু ঐ গ্রামে গড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি ।

মেহেরকুলঃ

আধুনিক কুমিল্লার মধ্যযুগীয় নাম মেহেরকুল । কুমিল্লার প্রাচীন নাম কমলাঙ্ক নগর । ধন্যমাণিক্যের আমলে মেহেরকুল ত্রিপুরার অধীনে আসে । মেহেরকুল দুর্গের আধিপত্যের জন্য অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে । হোসেন শাহী সৈন্যরা রায়কাচাগকে পরাস্ত করে খুব সম্ভবত ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩ খৃঃ) মেহেরকুল দখল করে । পরে ত্রিপুর-বাহিনী হোসেন শাহী সৈন্যদের বিতাড়িত করে পুণরায় মেহেরকুল দখল করে । কৈলাস চন্দ্রের মতে গৌড় সেনাপতি হৈতান খাঁ ১৪৩৬ শকাব্দে (১৫১৪ খৃঃ) আবার মেহেরকুল অধিকার করেন কিন্তু পরে পরাস্ত হয়ে বিতাড়িত হন । মেহেরকুল আবার ত্রিপুররাজের শাসনে আসে । উদয়মাণিক্যের রাজত্বকালে অমরদেব মেহের কুলের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন । যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে মির্জানুরুল্লা মেহেরকুল দখল করেন এবং সেখান থেকে রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে দখল করেন । ১৬২৪ খৃঃ মেহেরকুল পরগণা ত্রিপুররাজের হস্তচ্যুত হয় এবং চাকলারোশনাবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ত্রিপুররাজগণের জমিদারীতে পরিণত হয় । বৃটিশ রাজত্বকালেও এই জমিদারী বজায় ছিল । ভারত বিভাগের সময়ে মেহেরকুল পরগণাসহ চাকলারোশনাবাদ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয় । কুমিল্লাতে প্রাচীন মেহেরকুল দুর্গের কোন চিহ্ন বর্তমানে নেই ।

সোনামাটিয়াঃ

বর্তমান সোনামুড়া মহকুমার সদর দপ্তর সোনামুড়া গোমতী নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত । সোনামুড়ার মধ্যযুগীয় নাম হচ্ছে সোনামাটিয়া বা সাভারগড় দুর্গ । সোনামাটিয়া মেহেরকুল থেকে প্রায় ৯ মাইল পূর্বে এবং রাজধানী উদয়পুর থেকে প্রায় ২১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । কোন দুর্গের চিহ্ন বর্তমানে নেই । বাংলাদেশ সীমান্তবরাবর গাজীর আইল ও গাজীর কোট সমসের গাজী দ্বারা নির্মিত গড় আজও বিদ্যমান । সোনামাটিয়া গড়ে গোরাই মালিকের বাহিনীর সঙ্গে ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগের যুদ্ধ হয় । পরবর্তী কালে এখানে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে কারণ রাজধানীর পথে পশ্চিম দিক থেকে এটিই ছিল পার্বত্য রাজ্যের সীমান্ত দুর্গ ।

চণ্ডীগড়ঃ

উদয়পুর সোনামুড়া সড়ক পথে উদয়পুর থেকে ১৪ মাইল পশ্চিমে চণ্ডীগড় অবস্থিত । এই স্থানে চারিদিকে ছড়ান ভগ্ন ইট, ভগ্ন দেয়াল ইত্যাদি প্রমাণ করে যে এককালে এখানে দুর্গ ছিল । গোরাই মালিক (১৫১৩ খৃঃ), মীর্জা নুরুল্লা (১৬২১ খৃঃ), নরেন্দ্রমাণিক্য (১৬৭৬ খৃঃ), জগৎ মাণিক্য (১৭২৯ খৃঃ) এবং সমসের গাজীর বিরুদ্ধে (১৭৪৮–১৭৬০ খৃঃ) অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ চণ্ডীগড়ে সঙ্ঘটিত হয়েছিল । মধ্যযুগে পশ্চিমসীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে চণ্ডীগড় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ।

যশপুরঃ

উদয়পুরের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি গ্রাম বলে শ্রী রাজমালা সম্পাদক উল্লেখ করেছেন । কিন্তু বর্তমানে যশপুর নামে কোন গ্রামের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না । রাজমালাতে অমরমাণিক্য জবানীতে উল্লেখ আছে–

"জসপুর হতে আমি গোয়ালগ্রামে আসি।
সন্দর সময় তাতে ভয় নাহি বাসি॥
বিজয়মাণিক্য রাজার চাকরি কারণ।
বিংসতি বৎসর ছিল বয়স তখন॥৮"

বিশ বৎসরের যুবক অমরদেব তাঁর ভাই মহারাজ দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্যের অধীনে চাকুরী করতেন এবং জসপুর সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। রাজার আদেশ পেয়ে তিনি সন্ধ্যাকালে জসপুর থেকে গোয়ালগ্রামে আসেন। "গোয়ালগ্রাম" বর্তমানে গকুলপুরের দক্ষিণে অবিস্থিত গোয়ালগাঁও নামে পরিচিত।

মহেশ পুষ্করিণী ঃ

এখানে গড়ের অবস্থিতির কথা রাজমালাতে উল্লেখ নেই। কিন্তু গাজী নামাতে মহেশ পুষ্করিণীর দখল নিয়ে ত্রিপুর-সৈন্য ও গাজীর সৈন্যদের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। গাজীনামার মতে রাজমন্ত্রী ও সেনাপতিগণ প্রবল যুদ্ধ করেও মহেশ পুষ্করিণী রক্ষা করতে পারেন নি। বিজয়ী সমসের গাজী পরাস্ত ত্রিপুর বাহিনীর পিছু পিছু রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয় এবং অবশেষে রাজধানী দখল করে। বর্ণনা অনুযায়ী উদয়পুর-খণ্ডল পথের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ঘাঁটিটিই মহেশ পুষ্করিণী বলে মনে হয়।

আলোচ্য দুর্গগুলি "রাজধানীর চতুস্পার্শে" কতটা দূরে দূরে অবস্থিত ছিল তা সংলগ্ন মানচিত্র দেখে অনুমান করা যেতে পারে। ত্রিপুরার বর্তমান মানচিত্রে দুর্গগুলির সম্ভাব্য অবস্থান দেখান হল। অধিকাংশ গড়ই সম্ভবতঃ মাটির তৈরী ছিল, কেবল মাত্র কৈলাগড়, জামির খাঁন গড়, চণ্ডীগড় ও কলমীগড়ে ইটের টুকরা ছড়ান পাওয়া গেছে। সম্ভবত এই দুর্গগুলির দেয়াল ইটের তৈরী ছিল। মাটির দেয়াল সহজেই নষ্ট হয়ে যায় বলে এগুলির কোন সন্ধান পাওয়া বর্ত্তমানে কঠিন। এত বেশী সংখ্যক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা সত্বেও প্রাচীন রাজধানী বারবার লুণ্ঠিত হয়েছে। লুণ্ঠিত হতে হতে অবশেষে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি কি ছিল তা অবশ্যই বিচার, বিবেচনা করা দরকার। আশা করছি ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

—ঃ পাদটীকা ঃ—

১। শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, মধ্যমণি, পৃঃ ২৮০।
২। কৈলাসচন্দ্র, পূর্বে উল্লিখিত, ২য়ভাগ, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ৮৯।
৩। শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয়লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৮০।
৪। শ্রী রাজমালা, তৃতীয় লহর (১৩৪১ ত্রিং), মধ্যমণি, পৃঃ ৩৫৮।
সম্পাদক মহাশয় 'চম্পক বিজয়' নামক পুঁথি থেকে উধৃতি দিয়ে নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
৫। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫৫।
৬। শ্রী রাজমালা, দ্বিতীয় লহর, মধ্যমণি, পৃঃ ২৭৩।
৭। তদেব, পৃঃ ২৭৩।
৮। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫৪।

অষ্টম অধ্যায়

লুণ্ঠিত রাজধানী

রাঙ্গামাটি বা উদয়পুরে ত্রিপুর-রাজধানী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হত্যা ও লুণ্ঠনের সাহায্যে এবং কালের করাল গতিতে ত্রিপুরগণ রাজধানী পরিত্যাগ করেছেন লুণ্ঠন কারীদের অত্যাচারে। মধ্যযুগে যুদ্ধের সঙ্গে লুণ্ঠন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। সেজন্য রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলেও উলুখাগড়া প্রজাদের ধন ও প্রাণ নাশ হত বেশী। রাজা হয়তো বা পালিয়ে গিয়ে মানে মরেছেন কিন্তু প্রাণের বেঁচেছেন কিন্তু বেচারী প্রজাকুল দুই কুলই হারিয়েছে বিজয়ী লুণ্ঠনকারীর খড়্গাঘাতে বা রিপুর তাড়নায়। এই অধ্যায়ে আমরা চেষ্টা করবো ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজধানী লুণ্ঠনের এবং অবাধে ধন সম্পদ অপহরণের একটি চিত্র আঁকতে।

মহারাজ ১ম রত্নমাণিক্য রাজধানী দখল করলেও লুটপাট করেন নি। নিজের রাজধানী কে আর লুটপাট করে ? কেবলমাত্র অন্য দাবীদারদের দূর পার্বত্য অঞ্চলে বিতাড়িত করে রত্নমাণিক্য নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ অমর মাণিক্যের রাজত্বকালে খুব সম্ভবতঃ ১৫৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে আরাকানের মগ সৈন্যবাহিনী প্রথমে রাজধানী উদয়পুর লুণ্ঠন করে। সময় সম্পর্কে রাজমালাতে উল্লেখ আছে যে–

"কাল নভ সর চন্দ্র সকে চৈত্র মাসে।
প্রথমে আসিল মগ উদয়পুর দেসে ॥১"

শ্লোকটি এভাবে অর্থ করা চলে। কাল অর্থাৎ ত্রিকাল = ৩, নভ অর্থে আকাশ মহাশূন্য = ০, সর খুব সম্ভবতঃ শর মানে বাণ অর্থাৎ পঞ্চবাণ = ৫, চন্দ্র আকাশে একটিই থাকে = ১। সাজালে দাঁড়াচ্ছে ৩০৫১ এবং হিন্দুশাস্ত্র মতে "অঙ্কস্য বামাগতি"র ফলে সংখ্যাটি ১৫০৩ হচ্ছে। "সক" শকাব্দ বুঝাচ্ছে। তাহলে সময় পাওয়া গেল ১৫০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে।

মগবাহিনী রাজধানীতে প্রবেশের প্রাক্কালে অমরমাণিক্য রাজধানী ত্যাগ করে তৈতৈয়া পলায়ন করেন। তৈতৈয়া বর্তমানের খোয়াই শহর। মগরা পনের দিন ধরে রাজধানীর ধনসম্পদ লট করে। রাজা প্রজাপুঞ্জের নিকট থেকে ধনরাশি সংগ্রহ করে প্রাসাদের অভ্যন্তরে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে রাজধানী ত্যাগ করেন। কিন্তু মগ সেনাপতি দুইজন পলায়মান "দেওড়াই" অর্থাৎ চতুর্দ্দশ দেবতার সেবকদের ধরে ফেলেন এবং তাদের রাজ্যলোভে প্রলোভিত করে গুপ্তধনের সন্ধান জেনে নেন এবং সমস্ত ধনরাশি আত্মসাৎ করেন। নগরীর লোকজন প্রাণভয়ে দিগবিদিগ জ্ঞান শূন্য হয়ে পলায়ন করে। রাজমালার ভাষায়–

"লৈক্ষ ২ লোকসব যথা তথা গেল।
ডোমঘাটি পথে রাজা তমকানে গেল ॥"[২]

"প্রজাবর্গ আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে নিস্তার লাভের নিমিত্ত ধনসম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, সমৃদ্ধ উদয়পুর নগর সহসা এক ভীষণ অবস্থা ধারণ করিল।৩" রাজধানীচ্যুত অমরমাণিক্য মনের দুঃখে আফিম খেয়ে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু প্রজাবর্গের কি হল, তাদের কত পরিমাণ প্রাণ ও ধনসম্পদ নষ্ট হল তার বিবরণ রাজমালাকার দেননি। তবে লোকগাঁথাতে প্রজাপুঞ্জের কিছু আক্ষেপ কোন কোন গ্রন্থকার নথীভুক্ত করেছেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখেছেন যে বাল্যকালে তিনি একটি গ্রাম্যগীতি শুনেছিলেন এবং এই গীতি তিনি অমরমাণিক্যের উদয়পুর ত্যাগের প্রতিক্রিয়া বলে মনে করেন–

"রাজা ভাগল খাইল রে।
উদয়পুরের সিংহাসন কারে দিলারে।
পাণিত কান্দে পাণি খাউরি,
শুকনায় কাদে উদ।
উদয়পুরের গোয়ালে কাঁদে
কারে দিবাম দুধ।৪"

দেবালয়গুলির মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের চূড়া মগ আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কল্যাণমাণিক্য ঐ মন্দিরের চূড়া সংস্কার করেছিলেন। আর কোন মন্দিরের উপর আক্রমণ হয়েছিল কিনা রাজমালার সাক্ষ্যে তা জানা যায়না।

অমরমাণিক্যের পৌত্র যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে রাজধানী উদয়পুর আরও ব্যাপকতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ইস্পিন্দার খাঁ ও মীর্জা নুরুল্লার নেতৃত্বে মোগল বাহিনী ত্রিপুরার প্রতিরোধ ধ্বংস করে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে উদয়পুর দখল করে। ডঃ ভট্টশালীর মতে মীর্জানুরুল্লা কর্তৃক উদয়পুর দখলের সময় ১৬২১ খৃষ্টাব্দের শীতকাল। যশোমাণিক্য বিপুল ধনসম্পদ ও পারিবারিক গয়নাগাঁটি সহ মোগল বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।৫ যশোমাণিক্যের রাজধানী ত্যাগের পর মোগল বাহিনী উদয়পুরে প্রবেশ করে অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচার করে রাজধানী জনশূন্য করে ফেলে। রাজমালার ভাষায়–

"ইখান উদয়পুর মগলে লইল।
প্রধান ত্রিপুরা জত নানাস্থানে গেল॥
কুটুম্ব সম্পর্কে লোক গেল নানা দেস।
কেহ ২ পর্ব্বতেত করিল প্রবেস॥৬"

মোগল বাহিনী কেবল লুটপাট করেই ক্ষান্ত হয়নি। তাদের প্রবল অর্থলিপ্সা রাজধানীতে নতুন বিপর্যয় ডেকে আনে। উদয়পুরের দীঘিগুলি কেবলমাত্র রাজধানীর সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে নি, পানীয় জলের উৎসরূপে এগুলির ব্যবহার গত ২৫/৩০ বৎসর পূর্বেও অব্যাহত ছিল। বলা বাহুল্য দীঘিগুলিই ছিল সেকালের পানীয় জলের একমাত্র উৎস। বিজয়ী মোগল বাহিনী ঐসব বড় বড় দীঘিতে ধনরত্ন লুকান আছে সন্দেহ করে। ধন লোভে তারা বিজয়সাগর, অমরসাগর ইত্যাদি দীঘি সেঁচে জলশূন্য করে ফেলে। ফলে পানীয় জলের অভাব ঘটে। বাধ্য হয়ে মোগলরা নদীনালার জল পান

শুরু করে এবং প্রকৃতির প্রতিশোধের শিকারে পরিণত হয়। অপেয় জলপান করার ফলে রাজধানীতে মহামারী দেখা দেয়। দলে দলে মোগল সৈন্য রোগে আক্রান্ত হতে লাগল। মৃতের সংখ্য দিনে দিনে এত বাড়তে থাকল যে অবশেষে মোগলবাহিনী বাধ্য হয়ে রাজধানী ত্যাগ করে মেহেরকুলে সমতল ভূমিতে চলে গেল। এই ঘটনা ঘটে সম্ভবতঃ ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে। মোগল বাহিনী ধর্মাচরণেও হস্তক্ষেপ করেছিল। দেবালয়ে বিশেষ করে ত্রিপুরাসুন্দরী ও চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা বন্ধ করে দিয়েছিল। এভাবে প্রায় আড়াই বৎসর রাজধানী দখল করে রেখে মোগলরা নাগরিকদের ধনপ্রাণ বিপন্ন করেছিল। কিন্তু প্রজাবর্গের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব রাজমালাকার দেননি বরঞ্চ রাজার রাজ্যত্যাগের বর্ণনা সম্বলিত রাজভক্ত প্রজাদের সারিগান আমাদের উপহার দিয়েছেন ; যেমন–

"রাজা কৈ গেলা রে–
তোমার সোনার উদয়পুর কারে দিলারে !
কতদূরে গিয়া রাজা
ফির‍্যা ফির‍্যা চায়,
(আমার) সোনার মোড়ান পাল্কী
মোঙ্গলে দৌড়ায়–
দুঃখ রহিল রে !"[৯]

পরবর্তীকালে নক্ষত্র রায়ের ত্রিপুরা ত্রিপুরা অভিযান এবং গোবিন্দ মাণিক্যের রাজধানী ত্যাগ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের এই পারিবারিক বিরোধে প্রজা বর্গের বা রাজধানীর বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে রাজমালা বা অন্যান্য গ্রন্থও কোন সাক্ষ্য প্রদান করে না। ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দ মাণিক্যের ক্ষমতা দখলের সময়েও কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটেনি। গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণের মধ্যে ক্ষমতা দখলের বংশানুক্রমিক লড়াইতে বিভিন্ন সময়ে বাঙলার মোগল বাহিনীর সহায়তা নিলেও সপ্তদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত মোগল বাহিনী কর্তৃক রাজধানী দখল বা রাজধানী লুটপাটের ঘটনা ঘটেনি।

দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য (১৭১৪-১৭২৯ খৃঃ) গোবিন্দমাণিক্যের অন্যতম পৌত্র। তাঁর রাজত্বকালে ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎরাম মীরহাবীবকে ত্রিপুরা বিজয়ে সাহায্য করেন। মীরহাবীব ঢাকার ২য় মুর্শিদকুলির নায়েব ছিলেন। নবাব সুজাউদ্দিনের অনুমতি নিয়ে মীরহাবীব ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। জগৎরামের প্রদর্শিত পথে অতিদ্রুত রাজধানীর পথে অগ্রসর হন। মোগলবাহিনী এত দ্রুত উদয়পুরে পৌঁছেছিল যে রাজা ধর্মমাণিক্য প্রস্তুতি নেবার কোন সুযোগ পাননি। অতর্কিত আক্রমণে পরাস্ত রাজা অতিদ্রুত রাজধানী পরিত্যাগ করে গভীর অরন্যপ্রদেশে পলায়ন করেন। বিনা বাধায় মোগল বাহিনী রাজধানী লুণ্ঠন করে। শ্রী রাজমালার মতে মোগল রাহিনী–

"রাজমঙ্গল আদি করি যত হস্তি ছিল।
রাজধানী যাহা পাইল লুটিয়া যে নিল॥"[১০]

কৈলাসচন্দ্রের মতে মীর হাবীবের সঙ্গে ধর্মমাণির্ক্যের যুদ্ধ কুমিল্লার নিকটবর্তী স্থানে হয়েছিল। কাজেই রাজধানী লুণ্ঠনের অবকাশ তার বিবরণীতে নেই। কিন্তু স্যার যদুনাথের মতে সে সময়ে ধর্মমাণিক্য চণ্ডীগড়ে অবস্থান করছিলেন। মীর হাবীব চণ্ডীগড় বিধ্বস্ত করে রাজাকে পলায়নে বাধ্য করেন এবং লুটপাট করে প্রচুর ধনরত্নসহ ঢাকাতে চলে যান। এত ধনরত্ন তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন যে নিজের প্রভু মুর্শিদকুলীকে খুশি করেও মুর্শিদাবাদে নবাব সুজাউদ্দিনের নিকট বেশ ভাল করে উপঢৌকন পাঠান।[৯] নিজের ভাগ অবশ্যই মীর হাবীব বিলিয়ে দেননি আশা করা যেতে পারে।

চণ্ডীগড় সাময়িক রাজাবাস হলেও প্রকৃতপক্ষে সেনা নিবাস, কাজেই চণ্ডীগড় লুটপাট করে এত ধন রত্ন মেলা সম্ভব নয়। শ্রী রাজমালার মতে চণ্ডীগড়ে পরাস্ত ত্রিপুর-বাহিনী জগৎরামের তৎপরতার জন্য রাজধানী রক্ষার সুযোগ পায়নি। জগৎরামের অতর্কিত আক্রমণে রাজধানীর পতন ঘটে। কাজেই পরিত্যক্ত রাজধানী লুটপাট করে এত বেশী পরিমাণে ধনরত্ন জোগাড় করা সম্ভব বলে মনে হয়। "নৌবহর-ই-মুরসিদ কুলি খানি'র মতে ত্রিমুখী আক্রমণে মীর হাবীব ধর্মমাণিক্যকে পরাস্ত করেন ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও জয়ন্তিয়া এই তিন অঞ্চল থেকে আক্রমণ সঙ্ঘটিত হয়েছিল।[১০] মীর হাবীব ধর্মমাণিক্যকে বন্দী করেন এবং ঢাকায় নিয়ে যান। কাজেই রাজধানী লুটপাটের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। যদিও ধর্মমণিক্য পরে নবাবের সহায়তায় পুণরায় পার্বত্যরাজ্যের অধিকার পান তবু রাজমালার বর্ণনাই সত্য বলে মনে হয়। লড়াই শুরু হয়েছিল হস্তিকর আদায় নিয়ে। লড়াই-এর ফলে ত্রিপুরাকে হারাতে হয়েছে অনেক হাতী আর রাজধানীর প্রচুর ধনসম্পদ।

রাজধানী উদয়পুর শেষবারের মত লুণ্ঠন করেন সমসের গাজী। মহারাজ ৩য় বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর সমসের রাজকর বন্ধ করে নিজেকে চাকলারোশনাবাদের অধিপতি বলে ঘোষণা করেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি (কৃষ্ণমাণিক্য) বারে বারে যুদ্ধ করেও সমসের কে পরাস্ত করতে পারেন নি। সমসের বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করেন। উদয়পুরের পতন ঘটল এবং যুবরাজ কৃষ্ণমণি গভীর অরণ্যে পালিয়ে গেলেন। সমসের গাজী বিনা বাধায় উদয়পুর লুণ্ঠন করেন।[১১] গাজী নামায় গাজী কর্তৃক উদয়পুর লুণ্ঠনের বিবরণ দেয়া হয়েছে।–

"এথ দেখি মনিপুরি রাজসৈন্যগণ।
উদএপুর মোহারাজা লই ততক্ষণ॥
ধাই পই গেল তারা সব আগরতলা (য়)।
গাজীর দিগের সৈন্য তবে বাহুড়ী খেলাম॥
উদয়পুরে রাজসৈন্য দিসাভ্রম হৈয়া।
কেহ বনে কেহ স্তলে গেল পলাইয়া॥
উদয়পুরে রাজধন যতেক আছিল।
সমসের গাজীর সৈন্য সব লুটি নিল॥১২"

যুবরাজ কৃষ্ণমণি সমসের গাজীর তাড়ায় রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রতিবেশী কাছাড় ও মনিপুরের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়েছেন। কৃষ্ণমাণিক্য আর পিতৃ-পুরুষের রাজধানীতে ফিরে আসেন নি। মীর কাশিমের বিচারে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্ধারিত হয়েছিলেন। সমসের গাজীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল নবাবের কামানের মুখে। পুরাতন আগরতলাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণমাণিক্যের পরবর্তী জীবন কেটেছে। এই ভাবে জুঝার ফা (৫৯০ খৃষ্টাব্দ) থেকে শুরু করে রত্নমাণিক্য পর্যন্ত প্রাক মাণিক্যযুগের প্রায় ৮৭৫ বৎসর এবং মাণিক্য যুগের রত্নমাণিক্য থেকে শুরু করে কৃষ্ণমাণিক্য পর্যন্ত (১৪৬৪-১৭৬০ খৃষ্টাব্দ) প্রায় ৩০০ বৎসর রাজধানীর মর্যাদা ভোগ করে অবশেষে–

"এগারশ সত্তের সন হএত যখন।
আগরতলা রাজধানী করিল রাজন ॥১৩"

এখানে ১১৭০ সন বলতে ১১৭০ ত্রিপুরাব্দ বুঝান হয়েছে। অতএব ১৭৬০ খৃঃ আগরতলাতে অর্থাৎ বর্তমান পুরাতন আগরতলাতে ত্রিপুর রাজধানী স্থানান্তরিত হল এবং বংশানুক্রমিক প্রাচীন রাজধানী চিরকালের মত পরিত্যক্ত হল।

এইভাবে বারে বারে লুণ্ঠিত হয়েছে প্রাচীন রাজধানী। একবারের লুণ্ঠনের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আবার পূর্ণসমৃদ্ধ হয়ে উঠার আগেই এসে গেছে পরের লুঠেরারা। লুণ্ঠনে রিক্ত, হতমান নগরী রাজধানীর মর্যাদা হারাল। এই অবাধ লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে একটি চিত্র আমাদের নিকট স্বচ্ছ হয়ে উঠছে, তা হল রাজধানীর প্রচুর ধন উৎপাদনের ক্ষমতা। এই উৎপাদন ক্ষমতাই লুঠেরাদের বারবার আকর্ষণ করেছে। এবার লুণ্ঠিত হয়ে আবার অতি অল্প সময়ে রাজধানী সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে এভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠার কারণ নাগরিকদের শ্রম-কৃষি এবং শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে। আরও একটি চিত্র পাশাপাশি ফুটে উঠে তা হল রাজধানী রক্ষার অক্ষমতা। বারে বারে নির্দিষ্ট পথ ধরে লুণ্ঠনকারীরা এসেছে, প্রতিরোধকারী নৃপতি রাজকোষ আর রাণীকে নিয়ে পালাচ্ছেন আর নাগরিকদের মাশুল দিতে হয়েছে জান, মান ও ধন দিয়ে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা অক্ষম রাজার রাজধানী সমৃদ্ধ করেছিল আপ্রাণ পরিশ্রমে।

–ঃ পাদটীকা ঃ–

১। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬১। ২। তদেব ঃ পৃঃ ৬১।
৩। শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, মধ্যমণি, পৃঃ ১৮৬।
৪। কৈলাসচন্দ্র, পূর্বে উল্লিখিত, দ্বিতীয়ভাগ, ষষ্ঠঅধ্যায়, পাদটীকা ক্রমিকসংখ্যা চার দ্রষ্টব্য।
৫। স্যার যদুনাথ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩০২। ৬। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬৮।
৭। শ্রীরাজমালা, তৃতীয়লহর, মধ্যমণি, পৃঃ২১৫
৮। শ্রী রাজমালা ৪র্থ লহর (অপ্রকাশিত), পৃঃ ২৯। ৯। স্যার যদুনাথ, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪২৬।
১০। সরকার যদুনাথ ঃ বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেন্ট, জে এ এস বি পৃঃ ১-৪।
১১। কৈলাসচন্দ্র, পূর্বে উল্লিখিত, ২য় ভাগ, দশম অধ্যায়, পৃঃ ১২১।
১২। গাজীনামা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫৭।
১৩। শ্রী রাজমালা, চতুর্থ লহর (অপ্রকাশিত), পৃঃ ৫১।

নবম অধ্যায়

রাজধানীর উৎসব অনুষ্ঠান

প্রাচীন রাজধানীতে কি কি উৎসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত ? একালের মত বারমাসে তের পার্বণে সেকালের নাগরিকরা মেতে উঠতেন কি ? এ ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাক্ষ্যের অভাবে নির্ভরযোগ্য বিবরণী তৈরী করার পক্ষে বাধা রয়েছে। তবু নানা বিবরণী থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং বর্তমান জনগণের কতিপয় বিশেষ উৎসব পালন রীতির প্রাচীনতা থেকে সেকালের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। আলোচনার সুবিধার্থে উৎসবগুলিকে ঋতু অনুযায়ী ভাগ করে বর্ণনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

(১) গ্রীষ্মকালীন উৎসব :

(ক) নববর্ষ : বাংলা সনের প্রথম দিনে বাঙ্গালীরা নববর্ষ উৎসব পালন করেন। মূলতঃ বাঙালী জনগণের উৎসব হলেও প্রশ্ন হচ্ছে একালের মত সেকালেও রাজ্যের সকল জনগণ নববর্ষ উৎসব পালন করতেন কিনা। কোন বিশেষ সাক্ষ্য পাচ্ছি না এ উৎসব পালনের কিন্তু যেহেতু রাজধানীতে প্রচুর বাঙ্গালী বসবাস করতেন সেজন্য অনুমান করা যেতে পারে যে নববর্ষ উৎসব পালন করা হত। ১৯৪৬-৪৭ সালেও দেখেছি নববর্ষে প্রাচীন রাজধানীর তহশীল কাছারীতে শুভ পুণ্যাহ উৎসব পালন করতে। নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজকীয় সরকারের ছুটির বিজ্ঞপ্তিও আমাদের নজরে আসে।[১] ঐতিহ্যবাহী না হলে এরূপ ঘোষণা করা বোধ হয় সম্ভব ছিল না।

(খ) গড়িয়া : বর্তমানে গড়িয়া উৎসব ত্রিপুরীদের প্রধান গ্রীষ্মকালীন উৎসব। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে রাজধানীর অর্থাৎ উদয়পুরের পার্শ্বস্থ গ্রামগুলিতেই বর্তমানে রাজ্যের প্রধান উৎসব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও অতীতের সাক্ষ্য এখনও আমাদের নজরে আসেনি তবু একথা সকলেই স্বীকার করেন যে এই উৎসব অতিপ্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী। বহু পূর্বকাল থেকে অনুষ্ঠিত হত বলেই ধারণা করতে অসুবিধা হয় না যে প্রাচীন রাজধানীতেও এই উৎসব বেশ ধুমধামের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হত।

(গ) মঙ্গলচণ্ডী : গ্রীষ্মকালীন উৎসব রূপে চণ্ডীদেবীর পূজা সম্পর্কে আমাদের ভাবনা করতে হচ্ছে। যদিও প্রাচীন রাজধানীতে কোন মন্দিরকে আমরা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির বলে চিহ্নিত করতে পারছিনা তবু অমরপুরের মন্দিরে দেবীর পূজা বহুকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে আসছে। যদি ও উক্ত মন্দিরের মূর্ত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নানা মত রয়েছে।[২] সেজন্য প্রাচীন ঐতিহ্যের খাতিরে বিষয়টি গবেষকদের সামনে খোলা রাখলাম। বাঙালী জনগণের সাংস্কৃতিক প্রভাব অন্য জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনাই বেশী।

(২) বর্ষার উৎসব ঃ

(ক) চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা ঃ

চতুর্দ্দশ দেবতা ত্রিপুর-রাজগণের কুল দেবতা। আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে চতুর্দ্দশ দেবতার বার্ষিক পূজা হয়। এই পূজা খার্চি পূজা নামে পরিচিত। জুঝার ফা রাঙ্গামাটি দখল করে সেখানে ত্রিপুর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তার নতুন রাজাধানীতে চতুর্দ্দশ দেবতা ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন যথোচিত মর্যাদায়। তাঁর পুত্র ডাঙ্গর ফার আমলে রাঙ্গামাটিতে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার বর্ণনা পাই রাজমালাতে–

"ডাঙ্গর ফা নামে তার পুত্র হইল রাজা।
সেখানে চতুর্দ্দসদেব করিলেক পূজা ॥"[৩]

পরে অবশ্য ডাঙ্গর ফা কুলাচার মতে রাজ্যের নানা স্থানে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা করেন। রাজা ধন্যমাণিক্যের আমলে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার উল্লেখ পাই, তবে ঐ পূজা দৈনন্দিন পূজা বলে মনে হয় না, কারণ–

"শ্রী ধন্যমাণিক্য রাজা যুদ্ধ জয় পাইয়া।
চতুর্দ্দশ দেব পূজে বিধি বলি দিয়া ॥"[৪]

এপূজা বিশেষ পূজা। সাধারণ বার্ষিক পূজা রূপে উহাকে অভিহিত করা যায় না। চৌদ্দদেবতার পূজাতে নরবলি দেয়া হত। যুদ্ধে পরাস্ত বন্দীদের দেবতার সামনে বলি দেয়া হত। দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্যের কালে যুদ্ধে বন্দী পাঠানদের চৌদ্দ দেবতার সামনে বলি দেয়া হয়েছিল।

"সহস্র শোয়ার কর্ত্তা পাঠান বিস্তর।
চতুর্দ্দশ দেবতারে দিল নরেশ্বর ॥"[৫]

এভাবে বার্ষিক পূজা ও বিশেষ পূজা দ্বারা চতুর্দ্দশ দেবতা ১১৭০ ত্রিপুরাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন রাজধানীতে পূজিত হয়েছেন। মাঝে মাঝে মগ ও মোগল আক্রমণে পূজা ব্যাহত হলেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার পূজা শুরু হয়েছিল। আজকের উদয়পুরে বহুপ্রাচীন মন্দিরের মধ্যে কোন মন্দিরে চতুর্দ্দশ দেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন তা নির্ণয় করা যায়নি এখনও। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমি "রাজগী ত্রিপুরার প্রাচীন মন্দির প্রসঙ্গে" গ্রন্থে করেছি। বর্তমানে খারচি পূজা উপলক্ষ্যে পুরাতন আগরতলাতে যে রূপ জমজমাট মেলা বসে সেরূপ মেলা প্রাচীন রাজধানীতে বসত কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে রাজ্যের প্রধান উৎসব বেশ ধুমধামের সঙ্গে রাজকীয় আড়ম্বরে সম্পন্ন হত এবং রাজা নিজে পূজাতে যোগ দিতেন এরূপ সাক্ষ্য ত্রিপুরা বুরঞ্জীতে পাওয়া যায়।[৬]

(খ) কের পূজা ঃ

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসব হচ্ছে কের পূজা। খারচি পূজার চৌদ্দ দিন পরে প্রথম শনি বা মঙ্গলবারে রাজধানীতে কের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আজকাল যদিও উৎসবের বাহার এবং নিয়ম কানুন তথা আচার বিচারের কঠোরতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে তবু প্রতি বছর নিয়মমাফিক পূজা হয়। কেরের সীমা সঙ্কুচিত হতে হতে কেবলমাত্র পূজাস্থলে সীমাবদ্ধ হয়েছে। গ্রামে গ্রামে বৎসরের যে

কোন সময়ে প্রকৃতিপুঞ্জ এই পূজা করে থাকে। নানা প্রকার চিহ্নদ্বারা, বিশেষ করে বাঁশের তৈরী, গ্রামীণ ওঝাই (পুরোহিত) কেরের সীমা নির্দেশ করে। লঙ্ঘন কারীর শাস্তি আবশ্যিক।

রাজমালাতে কের পূজা উল্লেখ করে বা কের পূজা বিষয়ক কোন শ্লোক নেই। দ্বিজবঙ্গচন্দ্র রচিত ত্রিপুর বংশাবলী নামক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে উল্লেখ আছে যে :–

"কের নামে মহামুদ্রা থাকে আড়াই দিন।
গালিম মন্ত্রে সেই মুদ্রা চন্তাই অধীন॥
সেই আড়াই দিন যদি জন্ম মৃত্যু হয়।
তবে জান কের মুদ্রা মূলে নষ্ট হয়॥"[৭]

শুধুমাত্র অনুমান করা যেতে পারে যে সেকালেও প্রাচীন রাজধানীতে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজন্যবর্গ এই উৎসব পালন করতেন যদিও কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করে তা প্রমাণ করতে পারছিনা। রাজ্যহারা ত্রিপুর-বংশধর বর্তমানে যে ভাবে বার্ষিক এ পূজার সীমানা তাঁর বাসভবনের চৌহাদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন কিন্তু পূজা পরিত্যাগ করতে পারেননি, সম্ভবতঃ শুধু এই কারণে যে এই পূজা তাঁর বংশের অবশ্য করণীয়।

(গ) রথযাত্রা :

বর্তমানে উদয়পুরে বেশ ধুমধামের সঙ্গে প্রতিবৎসর রথ যাত্রা উৎসব পালিত হয়। জগন্নাথ দীঘির দক্ষিণ পশ্চিমকোণে অবস্থিত প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের সামনে ছন বাঁশের তৈরী এক কুটিরে জগন্নাথদেব ভ্রাতা বলদেব এবং ভগ্নী সুভদ্রা সহ নিত্য পূজিত হতেন উড়িষ্যাবাসী মোহিনী মোহন ত্রিপাঠী নামক পুরোহিত বংশের সৌজন্যে। প্রাচীর বেষ্টিত এই স্থান জগন্নাথ বাড়ী নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে পাথরের তৈরী পেছনের মন্দিরটি জগন্নাথ মন্দির নয়। উহা গোবিন্দ মাণিক্য নির্মিত বিষ্ণুমন্দির।[৮] ছন বাঁশের তৈরী কুটির-মন্দির থেকে জগন্নাথদেব বলরাম ও সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে রথে যাত্রা শুরু করেন এবং মহাদেব বাড়ী মন্দির গুচ্ছের ভেতরে একটি ছনবাঁশের নবনির্মিত কুটিরে আটদিন কাটিয়ে নবম দিনে পুনরায় নিজ মন্দিরে ফিরে আসেন। যেহেতু বর্তমান মন্দিরটি প্রাচীন জগন্নাথ মন্দির নয় সেজন্য অন্ততঃ গোবিন্দ মাণিক্যের কালে এখানে থেকে রথযাত্রা শুরু হতো না। প্রকৃত পক্ষে বর্তমানের রথযাত্রার সূচনা প্রাচীন হলেও খুব প্রাচীন বলা চলে না। ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় বর্তমানের রথযাত্রা উৎসবের সূচনা হয়।[৯] কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের পূর্বে বা পরে রথযাত্রার সন্ধান না পেলেও এককালে যে প্রাচীন রাজধানীতে রথযাত্রা হতো তার প্রমাণ আমরা পাই রাজমালাতে। রাজমালার বিজয়মাণিক্যখণ্ডে উল্লেখ আছে যে :

"দত্যনারায়ণে জগন্নাথ মূর্ত্তি যানে।
মঠেত স্থাপনা কৈল পাইয়া পূণ্যদিনে॥

দ্বাদস মাসের জাত্রা করে বিধিমতে।
বহুতর ভক্তি করে পূজা নিতি নিতে ॥[১০]

এই বিজয়মাণিক্য হচ্ছেন দেব মাণিক্যের পুত্র দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্য এবং দৈত্যনারায়ণ হচ্ছেন তাঁর শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি। দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের (১৫৩২-১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ) নাবালক অবস্থায় দৈত্য নারায়ণ রাজ্যের প্রকৃতশাসক ছিলেন। উধৃত শ্লোকে শুধুমাত্র জগন্নাথ মন্দির স্থাপনা নয় বার মাসে বার যাত্রা শাস্ত্রানুসারে পালনের সংবাদ পাই। বার যাত্রার মধ্যে আষাঢ় মাসের রথযাত্রা প্রধানতম উৎসব। কাজেই বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে ও অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে প্রাচীন রাজধানীতে বেশ জাঁকজমক করেই রথযাত্রা উৎসব পালন করা হত বলে ধারণা করতে পারি।

(ঘ) **নাগপঞ্চমী ঃ** শ্রাবণমাসে নাগপঞ্চমী তিথিতে সর্পদেবতা তথা সর্পদেবীর পূজা বঙ্গীয় সমতল অঞ্চলে খুবই প্রচলিত। বিশেষ করে শ্রীহট্ট অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এই পূজার বিশেষ প্রভাব সংলগ্ন ত্রিপুরাতে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাচীন রাজধানীতে এই উৎসব পালনের কোন বিশেষ সাক্ষ্য আমাদের হাতে নেই। রাজ্যের কোন কোন জনজাতির সর্পভীতি আদৌ নেই কাজেই ভীতি বলে পূজার প্রশ্ন আসেনা। কিন্তু রাজধানীতে বসবাসকারী বঙ্গলোকেরা নিজেদের সংস্কৃতি হিসেবে নাগপঞ্চমী পালন করতেন অনুমান করা যেতে পারে এবং তাদের প্রভাবে অন্যান্য জনজাতি এই উৎসবে কতদূর অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা খোঁজখবর করা যেতে পারে।

(৩) **শারদোৎসব ঃ–**

(ক) **জন্মাষ্টমী ঃ** বিশিষ্ট এই ভারতীয় উৎসব ত্রিপুর রাজধানীতে খুব ঘটা করে পালন করা হত, এরূপ কোন সাক্ষ্য সাহিত্যিক আকরগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ত্রিপুর বংশধরদের বৃহৎভারতীয় সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত হয়ে যাবার পর আমরা দেখি রাজ্যে নানা দেবমন্দির গড়ে উঠেছে। তন্মেধ্যে বিষ্ণু মন্দিরই বেশী। বুরঞ্জীর সাক্ষ্যেও বিষ্ণু পূজার প্রচলন দেখা যায়।[১১] সেজন্য জন্মাষ্টমী পালিত হত বলে অনুমান করা যেতে পারে রাজা রাজধর বা যশোধর মাণিক্য বিশেষ বিষ্ণু ভক্ত রাজা ছিলেন।[১২] এতদব্যতীত যে রাজধানীতে শ্রীকৃষ্ণের দোল যাত্রার জন্য স্থায়ী মঞ্চ ছিল, সেখানে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হতনা ভাবা যায় না।

(খ) **দুর্গাপূজা ঃ** বর্তমানে দুর্গাপূজা ত্রিপুরার প্রধান উৎসব। প্রাচীন রাজধানীতে এই উৎসব খুব জাঁকজমকের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হত। প্রথম রত্নমাণিক্যের মুদ্রা এই বিষয়ে প্রথম আলোক পাত করে। মুদ্রা নির্মাণকারী ত্রিপুর রাজগণের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রথম রত্নমাণিক্যই প্রথম বলে বিবেচিত হন। সাক্ষ্য তাঁর ১৩৮৬ শকাব্দের মুদ্রা। তাঁর মুদ্রাগুলির গৌণদিকের লেখন ছত্রে কখনও "শ্রীদুর্গাপদ পরঃ" কখনও বা "শ্রী দুর্গারাধনাপ্রাপ্ত বিজয়" [১৩] বিরূদ আছে। এই বিরূদগুলি তাঁর দুর্গাপ্রীতি এবং তাঁর কালে রাজধানীতে দুর্গোৎসবের ইঙ্গিত দেয়। তার পরবর্তী কালে ত্রিপুর বংশধর ধন্যমাণিক্য থানাংচি দখল করার পর ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগ সেখানে দুর্গোৎসব করেন।

দুর্গোৎসব হয় তথা নৃপ নাম করি।
তদবধি থানার নাম ত্রিপুরার পুরী ॥[১৪]

থানাংচি বর্তমানকালে মিজোরাম রাজ্য। সেখানে কুকিদের বাস ছিল। কুকীদেশ ত্রিপুরার সামন্ত রাজ্য। অধীনতা অস্বীকার করায় রায়কাচাগ অভিযান করে কুকিদুর্গ ধ্বংস করেন। অধিকৃত দুর্গে দুর্গাপূজা করে রায়কাচাগ ত্রিপুর- রাজের দুর্গাপ্রীতির পরিচয় দিলেন।

তারপর অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে আমরা রাজধানীতে দুর্গোৎসবের ইঙ্গিত পাই। বর্তমানে পূজা উপলক্ষ্যে দূরদেশে কর্মরত সন্তানদের নিজগৃহে উপস্থিতি কামনা করেন পিতামাতাগণ। বস্তুতঃ সে কালেও অমরদেবের মধ্যে আমরা পিতৃহৃদয়ের এই সনাতন ভাবটি পরিস্ফুট দেখতে পাই। অমরমাণিক্যের কুমারগণ আরাকানের মগদের সঙ্গে যুদ্ধে রত, ছাউনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে। প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর ত্রিপুর সেনারা সাফল্যের মুখ দেখছে। যুবরাজ রাজধর পিতাকে যুদ্ধের সংবাদ জানিয়ে বার্তা পাঠালেন। পিতা অমরমাণিক্য পত্রোত্তরে পুত্রদের দেশে ফিরে আসতে আহ্বান জানালেন। কারণ–

"যে সব লিখিছতুমি এই তত্ত্বসার।
দুর্গোৎসব নিকট হইল আইস পুণর্বার ॥
তোমার যুদ্ধেতে পাইলে মগ ধরি আন।
ভবানী পূজাতে তাকে দিব বলিদান ॥"[১৫]

অমর মাণিক্যের উক্তি প্রমাণ করে যে তার রাজত্বকালে (১৪৯৯-১৫০৭ খৃঃ) রাজধানীতে বেশ ঘটা করে দুর্গোৎসব পালন করা হত।

কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বকালে দুর্গাগৃহ নির্মাণের কথা জানতে পারি। সম্ভবতঃ আগরতলাস্থ বর্তমান দুর্গাবাড়ীর মত স্থায়ী দুর্গাগৃহ নির্মাণ করে কল্যাণদেব নিত্য দুর্গাপূজা করতেন। তার নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

"দোলমঞ্চ নির্মাইল তার পূর্বদিগে।
দুর্গাগৃহ নির্মাইল সন্নিকট ভাগে ॥"[১৬]

কল্যাণ মাণিক্যের পৌত্র ২য় রত্নমাণিক্যের আমলে ত্রিপুরায় আগত আসাম রাজের দূতগণ মন্দিরে, "শিলার দুর্গার দশভূজা মূর্ত্তি" প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[১৭]

(৪) হেমন্তকালীন উৎসবঃ

(ক) দীপান্বিতার মেলাঃ

বর্তমানে দেওয়ালী উপলক্ষে ত্রিপুরাসুন্দরী বাড়ীতে জমজমাট মেলা বসে। হেমন্তকালে শ্যামাপূজা হলেও তা প্রকৃতপক্ষে শারোদোৎসবের শেষ পর্যায়ের গণউৎসব। ত্রিপুরাসুন্দরী পাঠদেবী বিধায় বহুদূর দেশ থেকে তীর্থযাত্রীগণ এবং রাজ্যের জাতি উপজাতি সকল শ্রেণীর জনগণ এই বার্ষিক মেলাতে আনন্দ সহকারে যোগদান করে। এই মিলন মেলার সূচনা কবে থেকে তা আমরা জানতে পারছি না উপযুক্ত সাক্ষ্য নেই বলে। ১৩০২ ত্রিপুরাব্দে শ্রীরাজমালা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন

সেন বিদ্যাভূষণ ত্রিপুরাসুন্দরী দর্শন করেন। তিনি এ বিষয়ে নানা তথ্য আমাদের পরিবেশন করেন কিন্তু মেলার কথা উল্লেখ করেন নি। ভাবতে পারি ১৩০২ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ মেলা নিয়ে খুব হৈ চৈ হতনা তাই সম্পাদকের কানে এরূপ কোন কথা আসেনি। ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীরাজমালার প্রথম লহরে মন্দির বিষয়ে অনেক তথ্য থাকলেও দেওয়ালী উপলক্ষে মেলার কোন উল্লেখ নেই। অথচ শিববাড়ীতে মেলার উল্লেখ রাজমালা সম্পাদক করেছেন। রাজমালার পদ্য পাঠেও মেলা বিষয়ক কোন শ্লোক নেই। সেজন্য অনুমান করা যেতে পারে যে এই মেলার প্রচলন হয়ত বা পরবর্তীকালে সূচনা হয়েছে।

(খ) **গঙ্গাপূজা ঃ** গোমতীর জলে গঙ্গাপূজা ত্রিপুরদের প্রাচীন উৎসব। তুইমা অর্থাৎ জলদেবী ও গঙ্গা সমার্থক। অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষ ধূমধামের সঙ্গে গঙ্গা পূজা করা হত।[১৮] এছাড়াও মাঝে মাঝে বিশেষ মানত উদযাপন উপলক্ষে গঙ্গা পূজার প্রচলন ছিল। গঙ্গা পূজার সময় গোমতি নদীতে বলি প্রদান করা হইত।[১৯] এই বলি আসলে নরবলি। ত্রিপুরা রাজ্যে নরবলি প্রথা খুব বেশী ছিল। ধন্য মাণিক্য বলির সংখ্যা কমাতে চেষ্টা করেন। যথাঃ–

"তিন বৎসরে এক নর চতুর্দ্দশ দেবে।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে॥
দৌচা পাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয়।
গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময়॥"[২০]

রাজধানীতে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে নদীর দুইপাড়ে বাঁশ পুতে বাঁশের দড়ি দিয়ে নদী জল আটকান হত। পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ম এই বাঁশের দড়ি লঙ্ঘন বা ছিন্ন করা যেত না। রাজঘাটে প্রহরী সদা এই বাঁধন পাহারা দিত। একবার রিয়াংদের বাঁশের ভেলা দ্বারা ঐ দড়ি ছিন্ন হলে বিশেষ গোলযোগ বাঁধে। তখন গোবিন্দ মাণিক্যের রাজত্বকাল। দোষী রিয়াংদের বন্দী করা হয়। রিয়াংরা ইচ্ছে করে দড়ি ছেড়েনি, প্রবল বেগে বয়ে যাওয়া বাঁশের ভেলা সামলাতে পারেনি। কাজেই নিজেদের নির্দোষ ভেবে রিয়াংগণ প্রতিবাদ করে ফলে দেখা দেয় প্রজা বিদ্রোহ। উহাই প্রথম রিয়াং বিদ্রোহ,অবশেষে রাণী গুণবতীর হস্তক্ষেপে এই বিবাদ মেটে।[২১]

(গ) **নবান্ন ঃ**–কার্তিকের শেষভাগে বা অগ্রহায়ণের প্রথমভাগে জুমচাষদ্বারা উৎপন্ন ফসল প্রথমে মইলুমা দেবতার ভোগ দিয়ে তারপরে ত্রিপুরীরা গ্রহণ করে। বাঙ্গালী জনসাধারণ ও নূতন শাইল চাউল নবান্ন উৎসব পালন করে গ্রহণ করে। সেকালে পাশাপাশি বসবাসকালে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একই সময়ে.রাজধানীতে নবান্ন উৎসব করত কিনা সাক্ষ্যের অভাবে আমরা জানতে পারছি না।

(৫) শীতকালীন উৎসব ঃ

(ক) **উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উৎসব ঃ** উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন পবিত্র স্থানে এবং নদীসঙ্গমে স্নানতর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে মেলা বসে নানা স্থানে। পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে মাতার বাড়ীতে জমজমাট মেলা বসে। দূর দেশ

থেকে তীর্থযাত্রীরা এবং রাজ্যের জাতি উপজাতি সকল শ্রেণীর জনগণ এই বার্ষিক মেলায় যোগদান করে। এই মেলা খুব বেশী প্রাচীন নয়। ১৩০২ ত্রিপরাব্দে শ্রীরাজমালা সম্পাদক ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির দর্শন করেন এবং নানা তথ্য আমাদের পরিবেশন করেছেন কিন্তু মেলার কথা উল্লেখ করেন নি। ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দে তাঁর সম্পাদিত শ্রী রাজমালাতে মন্দির বিষয়ক নানা তথ্য থাকলেও দেওয়ালী বা পৌষমেলা সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। অথচ তিনি শিববাড়ীর মেলার কথা উল্লেখ করেছেন। রাজমালার পদ্যপাঠেও মেলা বিষয়ক কোন শ্লোক নেই। সেজন্যই অনুমান করা যেতে পারে যে এই মেলা পরবর্তী কালের সংযোজন। পৌষ মেলা ও খুব প্রাচীন নয়। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত লিখেছেন "১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মায়ের বাড়ীতে বাৎসরিক মেলার অনুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছে। তৎপূর্বে এই মেলার অস্তিত্ব ছিল না।"[২২] কাজেই কৃষ্ণমাণিক্য কর্তৃক রাজধানী পরিবর্তনের পূর্বে প্রাচীন রাজধানীতে দীপান্বিতা এবং পৌষমেলা অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে কোনরূপ সাক্ষ্য আমরা উপস্থিত করতে পারছি না। তবে দেবীস্থান পীঠস্থান বলে শ্যামাপূজা উপলক্ষে সাধুসন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তজনের সমাবেশ বেশী হবারই সম্ভাবনা। আর লোকসমাবেশ বেশী হলেই তা কালক্রমে অন্যান্য উপকরণ সহযোগে মেলার রূপ প্রাপ্ত হয়।

(খ) শ্রীপঞ্চমী : প্রাচীন রাজধানীতে শ্রীপঞ্চমী তথা সরস্বতী পূজা উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠানে হত কিনা তা উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে নির্ণয় করা কঠিন। উক্ত দেবীর জন্য নির্মিত কোন মন্দির বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রাজধানীতে পাওয়া যায়নি। কিন্তু বঙ্গলোকের প্রভাবে উক্ত দেবী অর্চনার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবু আরও গবেষণা সাপেক্ষে এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করা সমীচিন মনে হয় না। যদিও মন্দিরে সরস্বতী পূজার কথা বুরঞ্জী উল্লেখ করেছে।[২৩]

(৬) বসন্তকালীন উৎসব :

(ক) দোলযাত্রা : শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে রং খেলা তথা হোলি উৎসব ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উৎসব। বর্তমানে এই উৎসব সারা ভারতে যুবউৎসবে পরিণত হয়েছে। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র বর্তমান রাজধানী আগরতলাতেও এই উৎসব রাজন্যশাসনকালে বেশ আড়ম্বরের সহিত পালন করা হত। স্বয়ং রাজা (বীরচন্দ্রমাণিক্য) হোলীর গান রচনা করতেন, সুর দিতেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের মহিমা গাইতেন ফাগ খেলার সঙ্গে সঙ্গে। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে যে এ উৎসব বেশ ঘটা করে পালন করা হত তার সাক্ষ্য কল্যাণ মাণিক্য নির্মিত স্থায়ী দোলমঞ্চ। বদরমোকামে এই জরাজীর্ণ দোলমঞ্চ আজও বিদ্যমান। যদি ও কোন শিলালিপি দ্বারা উক্ত মঞ্চের নামাকরণের সাক্ষ্য আমরা দিতে পারছিনা তবুশ্রী রাজমালার পাঠে কিন্তু দোলের মঞ্চের সাক্ষ্য রয়েছে :

"দোল মঞ্চ নির্মাইল তার পূর্বদিকে।
দুর্গাগৃহ নির্মাইল সন্নিকট ভাগে॥"[২৪]

এইটুকু সাক্ষ্যই আমাদের প্ররোচিত করছে ভাবতে যে প্রাচীন ত্রিপুর-রাজধানীতে দুর্গোৎসবের সঙ্গে দোল উৎসবও অনুষ্ঠিত হত।

(খ) চড়কপূজা ঃ চৈত্র শেষে শিবের গাজন বা চড়ক উৎসব ১৯৪৬-৪৭ সালে বেশ ঘটা করে প্রাচীন রাজধানীতে সম্পন্ন হতে দেখেছি। সারা বছর চড়কগাছ মহাদেব দীঘি তথা বিজয়সাগরে ঘুরে বেড়াত কিন্তু গাজনের দিনে ঢাকবাদ্য সহকারে শিববাড়ীর মেলার মাঠে চড়কপূজা হত। হাতে এরূপ জোরাল সাক্ষ্য নেই যে প্রাচীনতা বিচার করি এই উৎসবের। তবু মনে হচ্ছে এই উৎসব যেন প্রাচীন রাজধানীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

(গ) ধর্মপূজা ঃ ধর্মপূজার উল্লেখ না করলে প্রাচীন রাজধানীর উৎসব অনুষ্ঠানের সঠিক বিবরণ দেওয়া হবে না। কোন মাসে এই বিশেষ পূজা হত জানা যাচ্ছে না। তবে পূজা যে রাজকীয় তার সাক্ষ্য রয়েছে। আমি বর্ষশেষে এই পূজার উল্লেখ করলাম কোথায় অন্য সময়ে ও হতে পারে। কল্যাণ মাণিক্য ধর্মমন্দির তৈরীর করেছিলেন, মন্দির প্রসঙ্গে এই মন্দিরের আলোচনা পশ্চাতে আসছে।[২৫] রাজা মন্দির নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হননি। যথারীতি দেবতা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। পশ্চিম বঙ্গে ধর্মঠাকুর বা বারাদেবতা লৌকিক দেবতা, গ্রাম্য লোকজন সমাদরে পূজো করে। বীরভূম বাঁকুড়া এই দেবপূজার প্রচলন খুব বেশী। ত্রিপুরাতে ঐ একটি মন্দির ভিন্ন অপর মন্দিরের সন্ধান পাইনি। অবশ্য এখানে দেবতা লৌকিক নন একেবারে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।

(ঘ) শিবচতুর্দ্দশীর মেলা ঃ

শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষ্যে শিববাড়ীতে পনের দিন ব্যাপী মেলা বর্তমান উদয়পুরের আর একটি বিশিষ্ট উৎসব। কিন্তু এই মেলাও খুব প্রাচীন বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। ১৩১২ ত্রিং সন হইতে শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষ্যে স্থায়ীভাবে এই স্থানে মেলা স্থাপিত হইয়াছে। ১৩১৪ ত্রিং সন হইতে এই উপলক্ষ্যে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[২৬]" ১৩১২ ত্রিপুরাব্দ হচ্ছে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

শিবচতুর্দ্দশী ও দ্বীপান্বিতার মেলা বর্তমানে প্রাচীন রাজধানীর সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে এই মেলাগুলি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে অনুষ্ঠিত হত কিনা তা জানা যাচ্ছে না। তবে যেহেতু দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী অন্যতম পীঠদেবী, সেজন্য অনুমান করা যেতে পারে যে এত ঘটা না হলেও সেকালেও সম্ভবতঃ শ্যামাপূজা ও শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষ্যে মেলা জমত।

(ঙ) মদনপূজা ঃ একালের মত দোলযাত্রা বা সরস্বতী পূজার মত বসন্তকালীন উৎসব সেকালের রাজধানীতে হত কিনা তা জানা গবেষণা সাধ্য ব্যাপার। তবে মদনপূজা যে বেশ ঘটা করে অনুষ্ঠিত হত তা আমরা জানতে পারি। মহাদেবের রোষানলে ভস্মীভূত কামদেবের পুর্নজীবন উপলক্ষ্যে বসন্তশুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে প্রাচীন ভারতে মদন উৎসব পালন করা হত। ভারতীয় সংস্কৃতির এই উৎসবটি ত্রিপুরা রাজ্যেও বেশ ঘটা করে পালন করা হত। অমর মাণিক্যের রাজত্বকালে কল্যাণদেব বালকমাত্র। তখন কল্যাণদেব কৈলাগড় থেকে রাজধানী উদয়পুরে এসেছেন। সম্ভবতঃ কল্যাণদেব চৈত্রমাসে রাজধানীতে আসেন কারণ–

"পরে কল্যাণদেব আইল উদয়পুর।
চৈত্রে মদন উৎসব হইল প্রচুর॥"[২৭]

মদন পূজার সময়ে কল্যাণদেব রাজধানীতে এলেন। উৎসব উপলক্ষ্যে মহারাজ অমরমাণিক্য চতুর্দ্দোলা চড়ে মোট খেলার জন্য রাজপথ দিয়ে চলেছেন। পরিজনদের প্ররোচনায় বালক কল্যাণদেব রাজার গায়ে জল ছিটিয়ে দিলেন। জল নিয়ে খেলা করা মদনপূজার অঙ্গ, রাজা প্রজা সকলেই জলকেলীতে মেতে উঠত। অমরমাণিক্য বালকের সাহস দেখে বাহবা দিয়েছিলেন। মদনোৎসব মঠ বা মোট মেলা নামেও পরিচিত ছিল। যেমন–

"মদন তিথীতে রাজা অমর মাণিক্য।
জলে মঠ খেলা হেতু গেল পূর্ব্বদিগ॥ ইত্যাদি[২৮]

ত্রিপুরা বুরঞ্জীতে মহারাজ ২য় রত্নমাণিক্যের কালে অনুষ্ঠিত মদন পূজার বেশ সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। আসাম-রাজের দূতগণও বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথিরূপে মোট মেলাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পূজার আগের দিন অধিবাস হত। অধিবাসের দিন রাজা মান্যতা অনুসারে বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজপুরুষদের উপহার দিতেন। উপহার সামগ্রীর মধ্যে বাসন্তী রং-এর জামা-কাপড় বা পাগড়ী প্রধান ছিল এবং খেলার জন্য চামড়ার তৈরী মোট দেয়া হত। পরদিন কলাগাছের খোলে তৈরী ঘরে কামদেবের মাটির মূর্ত্তি বেশ জাঁক জমক সহকারে পূজা করা হত। পূজার বিশেষ উপকরণ ছিল নাড়ু। পূজা শেষে রাজা কামদেবের মূর্ত্তির গায়ে জল ছিটিয়ে দিতেন এবং উৎসবের সূচনা করতেন। তারপরে যুবরাজ প্রভৃতি অন্যান্য রাজপুরুষ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কামদেবের মূর্ত্তিতে জল ছিটিয়ে দিতেন। কামদেবের গায়ে এখানে আনুষ্ঠানিক জল ছিটানর পরে নাগরিকগণ মৃদঙ্গ সহযোগে কীর্ত্তন করতে করতে পরস্পরের গায়ে জল ছিটাতেন।

পরদিন গোমতী নদীতে মোটখেলা হত। উত্তম পোশাকে সজ্জিত রাজাকে একটি সজ্জিত হাতীর পিঠে বসান হত। হাতীর পিঠে ঘরের আকারে কাপড় দিয়ে হাওদা তৈরী করা হত এবং মূল্যবান অলঙ্কার দিয়ে হাওদা সাজান হত। রাজার আত্মীয় বর্গ, রাজপুরুষগণ এবং সভ্রান্ত নাগরিকেরা রাজদত্ত পোশাক পরে সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে বা হাতীতে আরোহণ করে রাজাকে নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে গোমতী নদীতে মোট খেলতে যেতেন। প্রায় দেড় হাজার পদাতিক, চল্লিশ জন অশ্বারোহী, চৌদ্দজন গজারোহী নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত হয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নিত। নানা বাদ্য সহাকারে শোভাযাত্রা চলত এবং পথের দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে নিশান নিয়ে অনেকলোক শোভাযাত্রার শোভাবর্ধন করত। এই বিশাল মিছিলে প্রায় দশহাজার লোক অংশগ্রহণ করত। গোমতী নদীতে সকলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি জল ছিটিয়ে মোট খেলত। নদীতে জলকেলি শেষ করে এই বিরাট দল আবার অমর সাগরে আর একপ্রস্থ জলকেলি করত। রাজা প্রজা সবাই মিলে এভাবে মদনপূজাকে সার্বজনীন করে তুলেছিল মনে হয়।

জলক্রীড়া শেষে মদনপূজার প্রসাদ দই, দুধ, ক্ষীর ও ভাঙ্গের নাড়ু সকলের মধ্যে বিতরণ করা হত। সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের বাড়ীতে প্রসাদ পাঠাবার রেওয়াজ ছিল। উৎসব শেষে রাজা সভাসদ, রাজপুরুষ ও গণ্যমান্য নাগরিকদের পোষাক উপহার দিয়ে সম্মানিত করতেন। এবারে ঘরে ফেরার পালা। ফেরার পথের দুই ধারে গৃহস্থ বধূরা কলাগাছ পুঁতে উলুধ্বনী সহকারে রাজাকে অভিনন্দন জানাত। রাজার নির্দেশে সেবকরা মুদ্রা বৃষ্টি করতে করতে রাজপুরীতে ফিরে আসত।[২৯] মদন উৎসবের এই বিবরণী ত্রিপুরাবুরঞ্জী অনুসারে লিখিত।

চৌগামখেলাঃ

রাজধানীর নাগরিকদের কোন বিশেষ ক্রীড়ায় সমবেত অংশগ্রহণের বা কোন ক্রীড়া প্রদর্শনীর বিবরণ রাজামালাতে পাওয়া যায়না। প্রথম রত্নমাণিক্যের একটি ক্রীড়াসক্তির কথা রাজমালাকার উল্লেখ করেছেন। এই ক্রীড়ার নাম চৌগাম। এই খেলা অনেকটা আজকালকার পোলো খেলার মত। অশ্বারোহী খোলোয়াড়গণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে কাঠের দণ্ডের সাহায্যে কাঠের বল নানা বাঁধার মধ্য দিয়ে মাঠের মাঝখানে অবস্থিত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতেন। রত্নমাণিক্য, চৌগাম খেলায় বিশেষ সুনিপুণ খেলোয়াড় ছিলেন। রাজমালার বর্ণনা অনুযায়ী রাজা মাঠের মাঝখানে নিজে সুসজ্জিত ধ্বজা রোপণ করতেন। খেলা হত বাজী ধরে এবং পণমুদ্রা ধ্বজাতেই বাঁধা থাকত। যে খেলোয়াড় জয়লাভ করবে সেই পণমুদ্রা পাবে—এই ছিল শর্ত। রাজা ও প্রজা সকলে মিলে দুই দলে বিভক্ত হয়ে খেলাতে অংশগ্রহণ করতেন।

"রাজা আর প্রজাই হইয়া দুই বল।
জে গুটি আনিতে পারে সে হএ সবল ॥৩০"

এখেলাতে ঘোড়ার কৃতিত্বও কম নয়। ঘোড়ার উপর নিয়ন্ত্রণ যে খেলোয়াড়ের যত বেশী সে খেলোয়াড় তত বেশী পটুতা প্রদর্শন করতে পারত। মাঠে ক্রীড়ামোদী নাগরিকরা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সমবেত হয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিত এবং নিজেরা আমোদিত হত।

"এহাতে জিনিতে পুনি ঘোটক চাতুরি।
কৌতুক দেখীছে কত নাগর নাগরী ॥৩১"

রত্নমাণিক্য এই খেলা কোথা থেকে প্রবর্তন করেছিলেন তা জানা যায়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই খেলার কোন উল্লেখ রাজমালাতে পাওয়া যায় না বা এই খেলা ঐতিহ্যবাহী খেলারূপে ত্রিপুরাতে চর্চা করাও হয় না।

সাধারণ শরীরচর্চা যেমন দৌড় কুস্তি ইত্যাদি প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। ধন্যমাণিক্য নিজে বলশালী হবার জন্য কুস্তি শিখেছিলেন। 'সূর্যখাড়াইত' নামে এক প্রকার দেহরক্ষীবাহিনীর উল্লেখ দেখা যায় যারা বাহিনীতে ঢোকার আগে একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হত। পরীক্ষাটি ছিল অক্লেশে সাতবার ধন্যসাগর পরিক্রমা করা।

"সপ্তবার ধন্যসাগর ফিরিতে যে পারে।
সূর্যখাড়া তা বলে বিশ্রাম না করে ॥৩২"

সেনাবাহিনীতে যোগদানের পরে অস্ত্রচালনা, অশ্বারোহণ, হস্তিচালনা ইত্যাদিতে পারদর্শিতার পরিচয় দিতে গেলে আগে থেকে নিশ্চয়ই অভ্যাস করার ব্যবস্থা ছিল। জীবিকা নির্বাহের জন্য অনেকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিত। যদিও প্রজা মাত্রই প্রয়োজনে যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। সেজন্য বলা যেতে পারে যে শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য এই সব ক্রীড়া অভ্যাস করা হত না।

—ঃ পাদটীকা ঃ—

১। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন (সম্পাদিত) ঃ ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন, আগরতলা, ১৯৭১ ইং, পৃঃ ২৫।

২। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ একবিস্মৃত রাজধানী অমরপুর, রাজধানী আগরতলা, এপ্রিল ১৯৮৭, পৃঃ ১৫

৩। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৬।

৪। শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয়লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৮।

৫। তদেব, পৃঃ ৪৬।

৬। ত্রিপুরা বুরঞ্জী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩০।

৭। শ্রীরাজমালা, প্রথমলহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪৪ (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

৮। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঃ রাজগী ত্রিপুরার প্রাচীন মন্দির প্রসঙ্গে, কলিকাতা, ১৯৮৮ ইং, পৃঃ ৩৯

৯। শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয়লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৯।

১০। শ্রীরাজমালা, তৃতীয়লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩০।

১১। ত্রিপুরা বুরঞ্জী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৬।

১২। কৈলাসচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, ২য়ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৭৪। কৈলাসচন্দ্র লিখেছেন রাজধর মাণিক্য প্রসঙ্গে ঃ তিনি একটি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহাতে সর্বদা বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। তিনি আটজন গায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা সর্বদা তাহাকে হরিসঙ্কীর্তন শ্রবণ করাইত।"

১৩। রমেশচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪৮৭।

১৪। শ্রীরাজশালা, দ্বিতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৯।

১৫। শ্রী রাজমালা, তৃতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩০।

১৬। তদেব, পৃঃ ৭৬।

১৭। ত্রিপুরা বুরঞ্জী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৬।

১৮। কৈলাসচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৩।

১৯। শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয়লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৯।

২০। তদেব, পৃঃ ২৯।

২১। শ্রীরাজমালা, ৪র্থ লহর, পৃঃ
২২। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৫ ।
২৩। ত্রিপুরা বুরঞ্জী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৬ ।
২৪। শ্রী রাজমালা, তৃতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, ঃ ৭৬ ।
২৫। পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য , পৃঃ
২৬। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৫ ।
২৭। শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২১-২২
২৮। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫৩ ।
২৯। ত্রিপুরা বুরঞ্জী ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬২ ।
৩০। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২০ ।
৩১। তদেব, পৃঃ ২০ ।
৩২। তদেব, পৃঃ ৪২ ।

দশম অধ্যায়

ইতিহাসের সাক্ষী

বহুকাল উদয়পুর ত্রিপুর-রাজধানীর মর্যাদা ভোগ করেছে। সেজন্য এখানে তৈরী হয়েছিল অনেক রাজকীয় আবাসগৃহ, দেব-দেউল প্রভৃতি, কারণ মানবসভ্যতা আবাসকেন্দ্রিক। আবাসগৃহকে ভিত্তি করেই জীবনের হাসি কান্নার খেলা। কালের করাঘাতে গৃহ নষ্ট হয়েছে, আবার নূতন গৃহ তৈরী হয়েছে, মন্দির জীর্ণ হয়েছে আবার কেউ মেরামত করেছে। কেউবা নিজের গৌরব ছড়াতে নূতন মন্দির তৈরী করেছে। এভাবে চলছে বহুকাল। পরিত্যক্ত হবার পর প্রাচীন রাজধানীর নানা স্থানে অবস্থিত আবাস গৃহ ও দেবদেউল ইটের পাঁজায় পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্বংসস্তূপ ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিছু কিছু আবাস কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বহুশত বৎসরের জীর্ণদেহ নিয়ে ধুকছে নিশ্চিত অবলুপ্তির প্রত্যাশায়। এইসব ইতিহাসের নীরব সাক্ষী যাদের সামনে একদা মানবজীবনরথ সরবে চলেছিল ভবিষ্যতের দিকে। এই জীর্ণদেহী সাক্ষীদের অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে এতই শোচনীয় যে কিছু কাল পরেই এগুলির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে। এই প্রবন্ধে সৌধ ও মন্দিরগুলির কালানুক্রমিক বিবরণ ও পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। সমস্ত রাজকীয় আবাসগৃহ তথা তাদের ধ্বংসস্তূপ শিলালেখহীন। কাজেই আনুমানিক চিহ্নিতকরণ কোন কোন ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে শনাক্ত করে সাক্ষ্যরূপে দাঁড় করাবার প্রয়াস মাত্র।

(১) রাজগৃহঃ

(ক) কমলাসাগর পাড়ের ধ্বংসস্তূপঃ (সঃ তাঃ ১৪৯০-১৫২০ খৃঃ)

উদয়পুর শহর থেকে ৭/৮ মাইল পশ্চিমে কমলাসাগর নামক দীঘির উত্তর পাড়ে ভগ্ন প্রাসাদের চিহ্ন ও ইটের স্তূপ দেখা যায়। এখান থেকে সংগৃহিত প্রাচীন ইটে ১৪৪১ ছাপ দেখা গেছে।[১] ১৪৪১ খুব সম্ভবত শকাব্দ কারণ এই অঙ্কের বঙ্গাব্দ বা ত্রিপুরাব্দ প্রাচীন ইটে লিখন অপ্রাসঙ্গিক। ১৪৪১ শকাব্দ হলে, ইটগুলি ধন্যমাণিক্যের (১৪৯০-১৫২০ খৃঃ) রাজত্বের শেষভাগে তৈরী হয়েছিল। কমলাদেবী ধন্যমাণিক্যের পত্নী। ত্রিপুরার অন্য কোন মহারাণীর নাম কমলা দেবী পাওয়া যায়না। তাহলে এই প্রাসাদ খুব সম্ভবত ধন্যমাণিক্যের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। দীঘিটি তাঁর পত্নী কমলাদেবীর নামে পরিচিত। কমলাসাগর দীঘির নাম থেকেই পরবর্তীকালে মৌজার নাম কমলাসাগর রাখা হয়েছিল। কিন্তু রাজমালাতে ধন্যমাণিক্য কর্তৃক এই স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ বা উক্ত প্রাসাদে বসবাসের কোন ইঙ্গিত নেই। কমলা দেবীর নামে প্রসিদ্ধ কমলাসাগর কসবাতে অবস্থিত। উদয়পুরের কমলাসাগরের উল্লেখ রাজমালাতে নেই। কিন্তু রাজমালাতে না থাকলেও ধ্বংসস্তূপ ও দীঘির উপস্থিতি তাঁদের স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করছে।

(খ) তারপাধূমেররাজবাড়ী (সঃ তাঃ ১৪৯০-১৫২০ খৃঃ) ঃ–

তারপাধূম বর্তমানে কাকড়াবন তুলামুড়া সড়কের পাশে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে একটি দীঘি কিছু ভগ্নআবাসের ধ্বংসস্তুপের চিহ্ন আছে। স্থানীয় লোকেরা উহাকে রাজবাড়ী বলে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে মেহেরকুল-উদয়পুর প্রাচীন পথ তারাপাধূমের পাশ দিয়ে মাতাবাড়ী হয়ে উদয়পুরে গিয়েছিল। আবার উদয়পুর খণ্ডল পথ ও এই স্থানের পাশ দিয়ে গিয়েছিল।[২] ধন্যমাণিক্যের আমলে হোসেন শাহী বাহিনী এখানে ছাউনি তৈরী করেছিল এবং দীঘিটি খনন করেছিল। সেজন্য এই ধ্বংসস্তূপ ধন্যমাণিক্যের কালের হওয়া সম্ভব।

(গ) ধ্বজমাণিক্যেরদেউল (সঃ তাঃ ১৫২০ খৃঃ) ঃ–

ধ্বজমাণিক্য নামে ত্রিপুর-রাজ কেউ ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। 'ত্রিপুর বংশাবলীর' মতে ধ্বজ বিখ্যাত ধন্য মাণিক্যের পুত্র। 'নয়শ পঁচিশ সনে' ধ্বজ রাজা হন এবং 'ক্রমাগত ছয়বৎসর রাজত্ব" করে "নয়শ একত্রিশ সনে" মারা যান।[৩] রাজমালার পদ্যপাঠে ধ্বজমাণিক্যের কোন উল্লেখ নেই। তার কোন শিলালেখ বা মুদ্রা ও আবিষ্কৃত হয়নি। কেবল উদয়পুর শহরের উত্তর পশ্চিমভাগে ধ্বজনগর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। সেখানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ধ্বজমাণিক্যের দীঘি বলে লোকমুখে খ্যাতি লাভ করেছে। সম্প্রতি ধ্বজনগরে গকুলপুর এলাকাতে মাটির নীচে প্রাপ্ত সূর্যমূর্ত্তি ও অনেক ইতস্ততঃ ছড়ান প্রাচীন ইট এই অঞ্চলে কোন বাড়ী ছিল বলে মনে ধারণা জাগায়।

(ঘ) উদয়মাণিক্যের বাড়ী (সঃ তাঃ ১৫৬৭-১৫৭৩ খৃঃ) ঃ–

উদয়মাণিক্যের নামে রাঙ্গামাটির নাম উদয়পুর করা হয়েছে। উদয়মাণিক্যের প্রকৃত নাম গোপীপ্রসাদ। তিনি ২য় বিজয় মাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে বিজয়মাণিক্য গোপী প্রসাদের কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্র অনন্তের বিয়ে দেন এবং অনন্তকে তার হাতে সঁপে দেন। বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজ্যলোভী গোপীপ্রসাদ জামাতাকে হত্যা করে নিজেই ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন।[৪] উদয়পুর-সাব্রুম রাস্তার ডান পাশে মাতার বাড়ী হতে কিছু দক্ষিণে চন্দ্রসাগর দীঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি ভগ্নমন্দির ও চারিদিকে ছড়ান ইটের টুকরা ও স্তূপ দেখা যায়। এই ধ্বংসাবশেষ উদয়মাণিক্য নির্মিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। মাণিক্য বংশীয় নৃপতিকে হত্যা করে নিরুপদ্রবে বাস করার জন্য তিনি সাবেকী প্রাসাদ পরিত্যাগ করে এই স্থানে নতুন প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন।[৫]

(ঙ) ছত্র মাণিক্যের প্রাসাদ ঃ (সঃ তাঃ ১৬৬১-১৬৬৬ খৃঃ) ঃ–রাজকীয় বাসগৃহগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পুরাতন রাজবাড়ী। বর্তমান উদয়পুর শহরের পূর্বভাগে বদরমোকাম পল্লীর বিপরীত দিকে গোমতী নদীর উত্তর পাড়ে রাজনগর গ্রামে একটি উঁচু পাহাড়ের উপর পুরাতন রাজবাড়ী অবস্থিত। অবস্থানের দিক থেকে স্থান নির্বাচনে সেকালের রাজা এবং স্থপতিগণ যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় রেখেছেন সন্দেহ নেই। কারণ প্রাসাদের প্রায় সামনেই গোমতী নদীর গভীর খাত

অথচ নদীগর্ভ থেকে সৌধ দেখা যায় না। প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে নদীপথে নৌচলাচল দুইদিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় এবং চারিদিকে দিগন্তসীমায় দৃষ্টি আবদ্ধ হয়। শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্যে বহুদূরের সৈন্যচলাচল লক্ষ্য করবার মত আদর্শস্থান এই প্রাসাদ দুর্গ কর্তমানে ভগ্নস্তুপে পরিণত। ভগ্নস্তুপ দেখে মনে হয় প্রাসাদ চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। উত্তর দিকের প্রাচীরের ভগ্ন অংশ এখনও চোখে পড়ে। প্রাসাদটি দ্বিতল ছিল বলে কেউ কেউ ধারণা করেন। চারিদিকে স্থানচ্যুত ইটের পাঁজার মাঝে এখনও সাধারণ একতলার চেয়েও বেশ উঁচু দেয়াল সম্পন্ন দু-তিন খানা কক্ষ চিহ্নিত করা যায়। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে মধ্যযুগে ঘরের উচ্চতা এখনকার তুলনায় অনেক বেশী রাখা হত। পাতলা ইটের তৈরী পুরু দেয়ালে এখনও পদ্ম চিহ্ন ও দেয়াল গিরির স্থান দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাসাদের পেছন দিকে প্রাচীরের বাইরে একটি বেশ বড় দীঘি রয়েছে। প্রাসাদের উত্তর পূর্ব-কোণেও একটি ছোট দীঘি রয়েছে। ত্রিপুরা বুরঞ্জীতে প্রদত্ত প্রাসাদের সঙ্গে এই প্রাসাদ দুর্গের অবস্থানগত ও বর্ণনাগত অমিল রয়েছে। প্রাসাদটি সম্ভবত দক্ষিণ মুখী ছিল, প্রধান দরজা বা সিংহ দ্বারের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। ছত্রমাণিক্যএই প্রাসাদ নির্মাণ করান বলে শ্রী রাজমালা সম্পাদক সিদ্ধান্তে এসেছেন।[৬] তবে ছত্রমাণিক্য বা নক্ষত্ররায় নির্মাণ করে থাকলেও গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ সম্ভবত এই প্রাসাদেই বসবাস করেছেন। কারণ প্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রয়েছে রামদেব মাণিক্য নির্মিত বিষ্ণুমন্দির। এই মন্দির রামদেব পিতা গোবিন্দমাণিক্যের স্বর্গ প্রাপ্তি কামনায় বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন।[৭] নিজের বাসস্থানের কাছাকাছি ইষ্টদেবতার মন্দিরের স্থান নির্বাচন স্বাভাবিক। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এই প্রাসাদই পুরাতন রাজধানীর শেষতম রাজগৃহ।

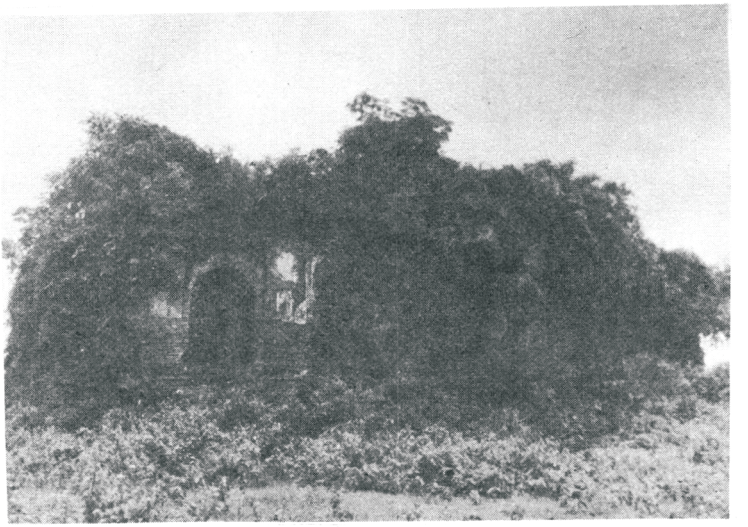

ছত্রমাণিক্যের প্রাসাদ

(চ) **গোবিন্দ মাণিক্যের বাড়ী** (সঃ তাঃ ১৬৬০-১৭৭৬ খৃঃ) ঃ–

গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে বদ মোকাম পল্লীতে গোবিন্দমাণিক্যের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছিল বলে শ্রীরাজমালা সম্পাদক উল্লেখ করেছেন ।[৮] এই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, বিশেষ করে ভগ্ন দেয়াল এবং অন্তঃপুরের মহিলা বৃন্দের বড়শী দিয়ে নদী থেকে মাছ ধরার স্থান তাঁর মনে বেশ দাগ কেটেছিল । বর্তমানে ভগ্ন দেয়াল লুপ্ত হয়ে ক্রমবর্ধমান জনতার আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে । অথচ ১৯৪৮-৪৯ সালেও ঐ দেয়াল এবং প্রাচীরের কিছু অংশ দেখেছি বলে স্পষ্ট মনে আছে ।

(ছ) **কাশীমাণিক্যের বাড়ী** (১৬২৭-২৯ খৃঃ) ঃ–

মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্য (১৮২৬-১৮২৯ খৃঃ) কোন কারণে আগরতলা ত্যাগ করে পুরাতন রাজধানী উদয়পুরে বাস করতেন । ১২৩৯ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৯ খৃঃ) উদয়পুরে তাঁর মৃত্যু হয় । জগন্নাথ দীঘি ও অমরসাগরের মধ্যবর্তী সমতল জমিতে একটি আমবাগানের মধ্যে ১৯৪৭-৪৮ সালেই ভগ্ন ইটের স্তুপ দেখেছি । স্থানীয় আধিবাসীরা এই স্থানটিকে কাশীমাণিক্যের বাসস্থান বলে চিহ্নিত করেতন ।[৯] বর্তমানে লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধির ফলে উক্ত সমতলজামিতে, যা ছিল একদিন শস্যক্ষেত্র, নতুন বসতি গড়ে উঠেছে ফলে ইটের পাঁজা ও বাগান বিলুপ্ত হয়েছে । এভাবে কত ঐতিহাসিক স্মৃতি-সাক্ষ্য লোপাট হয়েছে কে জানে !

(ঝ) **কাকড়াবনের রাজবাড়ী** (তারিখ বিহীন) ঃ–মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ১৩১২ ত্রিপুরাব্দে (১৯২০ খৃঃ) উদয়পুর আসার পথে "কাকড়াবন স্থিত পুরাতন রাজবাড়ী" নামকস্থানে রাত্রিবাস করেন । মহারাজের সঙ্গে যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর ও কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর অর্থাৎ লালু কর্তা ও সেখানে রাত্রি বাস করেন ।[১০] ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ঐ বাড়ীর প্রাচীর প্রত্যক্ষ করেন । এখন অনেক খোঁজ করে ও সন্ধান পেলাম না ।

(২) **দেব-দেউল** ঃ–এবারে মন্দিরগুলির অবস্থান ও পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি । তারিখ যুক্ত কালক্রম অনুসারে প্রথমে এবং পরে তারিখ বিহিন ও সম্ভাব্য স্থিরিকৃত তারিখের মন্দিরগুলির কথা বলব ।

তারিখযুক্ত দেবালয় ঃ–

(ক) **ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির** ঃ (১৫০১ খৃঃ ?) ঃ–

ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র পীঠস্থান দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির । উদয়পুর থেকে তিনমাইল দক্ষিণে মাতাবাড়ী নামক গ্রামে একটি নাতি উচচ টিলার উপর অবস্থিত । মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে জানা যায় যে মহারাজ ধন্যমাণিক্য ১৪২৩ শকাব্দে চট্টগ্রাম থেকে আনীত দেবী মূর্তি বিষ্ণুর জন্য তৈরী বর্তমান মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন ।[১১] এই শিলালিপি ধন্যমাণিক্য কর্তৃক বসান শিলালিপি নয় । পরবর্তী কালে ১৬০৩ শকাব্দে রামমাণিক্য কর্তৃক মন্দির সংস্কার করার যে শিলালিপি বসান হয় তাতে উল্লেখ আছে যে মন্দির প্রথম নির্মাণ করান ধন্যমাণিক্য ১৪২৩ শকাব্দে ।

শ্রী রাজমালাতে উল্লেখ আছে যে সেনাপতি রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ দেবীমূর্ত্তি আনেন চট্টগ্রাম থেকে। রাজমালাতে ধন্যমাণিক্যের চট্টগ্রাম অভিযানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে ১৪৩৫ শকাব্দে এবং পুণরায় ১৪৩৬ শকাব্দে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম দখল করেন।[১২] তার মুদ্রাও সাক্ষ্য দেয় ১৪৩৫ শকাব্দে চট্টগ্রাম বিজয়ের।[১৩] ১৪৩৬ শকাব্দে প্রেড়িত বাহিনীতে প্রথম রসাঙ্গ মর্দনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায়নি, রসাঙ্গ দেশ জয় করেছিলেন বলে তাঁর নাম দেয়া হয়েছিল রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ। কাজেই ১৪৩৬ শকাব্দের পূর্বে দেবীমূর্ত্তি আনা সম্ভব নয় কারণ এর পূর্বে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের দখলে ছিল না। আবার দেখা যাচ্ছে ১৪৩৭ শকাব্দে চট্টগ্রাম ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হয়ে বঙ্গদেশের সুলতানের দখলে চলে গেছে।[১৪]

রাজমালাতে মন্দিরের প্রধান দরজার উপরে দেয়ালে যে শিলালিপি বসান হয়েছিল তার পাঠ দেয়া আছে। সেই পাঠের নীচে অক্ষরে ও অঙ্কে লিখা আছে শক ১৪৪২। অর্থাৎ ১৪৪২ শকাব্দে দেবী মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৫] এখন কোন তারিখটি ধরা রীতি সম্মত হবে। আমার মতে ১৪৩৬ শকাব্দে দেবীমূর্ত্তি আনার পরে মন্দির তৈরী করে দেবী প্রতিষ্ঠা করতে ৬ বৎসর লাগা স্বাভাবিক। মন্দির তৈরী শুরু হয়েছিল আগেই কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ চলাকালে মন্দির তৈরীর কাজ নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত গতিতে এগোয়নি। সেজন্য আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ১৪৪২ শকাব্দেই হওয়া সম্ভব। উল্লেখযোগ্য যে ১৪৪২ শকাব্দেই ধন্যমাণিক্য পরলোকগমন করেন।

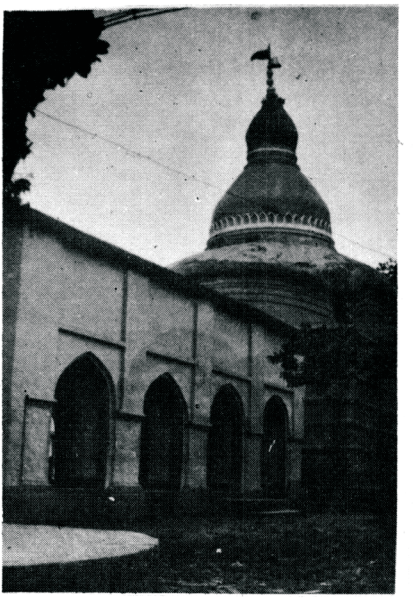

ত্রিপুরা সুন্দুরী মন্দির

মহাদেববাড়ী মন্দির গুচ্ছ ঃ—

মহাদেব বাড়ী মন্দির গুচ্ছ উদয়পুরের দেবতা পাড়া। একটি প্রাচীরের ভেতরে তিনটি মন্দির রয়েছে। প্রাচীরের দক্ষিণমুখী সিংহ দরজা দিয়ে মন্দির ভূমিতে প্রবেশ করা যায়। তিনটি মন্দিরের বর্ণনা নীচে দেয়া হল।

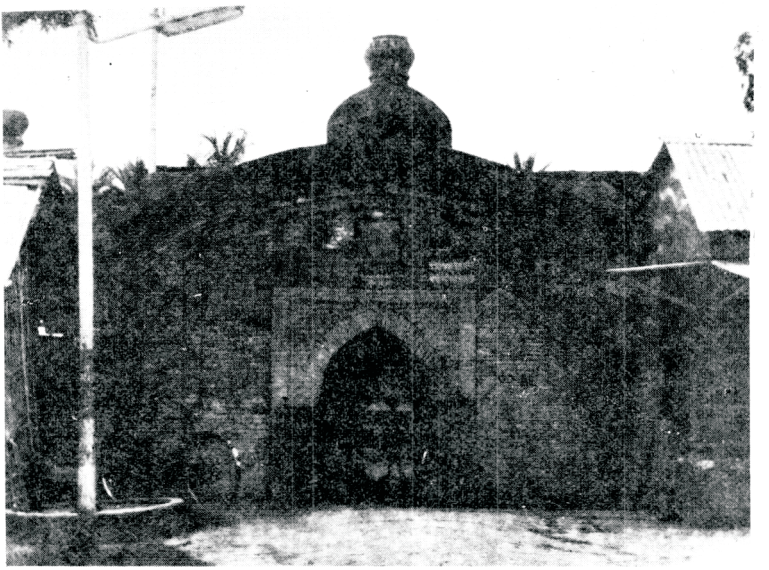

মহাদেব বাড়ী মন্দিরগুচ্ছের সিংহ দরজা

(খ) **ত্রিপুরেশ শিবমন্দির** (১৫০১ খৃঃ ?) ঃ–

প্রাচীরের ভেতরে একেবারে পূবদিকের পশ্চিমদ্বারী মন্দিরটিই হচ্ছে ত্রিপুরেশ শিবের মন্দির। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ আজও পূজা নিচ্ছেন ভক্তদের। ত্রিপুরেশ শিব দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর ভৈরব। দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী ত্রিপুরার পীঠ দেবী। মন্দিরগাত্রে সংযোজিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে এই মন্দির নির্মাণ করান মহারাজ ধন্যমাণিক্য। কালক্রমে ধন্যমাণিক্য নির্মিত মন্দির জীর্ণ হয়ে গেলে ১৫৭৩ শকাব্দে (১৬৫১ খৃঃ) মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য পুণরায় মন্দিরটি নির্মাণ করান এবং শঙ্করের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।[১৬] বর্তমান মন্দিরটি রাধাকিশোরমাণিক্য সংস্কার করান। মন্দিরের সামনে নাটমন্দির রয়েছে। নাটমন্দিরের চালা টিনের। নাটমন্দিরের মধ্যে রয়েছে বলিমঞ্চ।

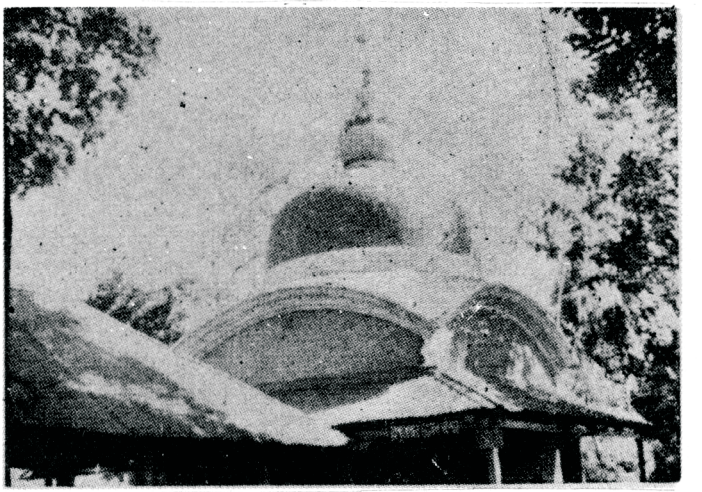

ত্রিপুরেশ শিব মন্দির

(গ) **গোপীনাথমন্দির** (১৬৫০ খৃঃ)

মহাদেব বাড়ী মন্দিরগুচ্ছের মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দিরটিই হচ্ছে গোপীনাথ মন্দির। সিংহ দরজা দিয়ে ঢুকেই সামনে নাটমন্দির সহ দক্ষিণদ্বারী মন্দিরটিই গোপীনাথ মন্দির। মন্দিরের নাটমণ্ডপের ছাদ নেই। স্থানীয় জনসাধারণ মন্দিরটি চতুর্দ্দশ দেবতার পরিত্যক্ত মন্দির বলে মনে করেন। শ্রী রাজমালা সম্পাদক মন্দির যথার্থই বিষ্ণুমন্দির বলে চিহ্নিত করেও অপরূপ যুক্তিজাল বিস্তার করে সর্বশেষে মন্দিরটিকে চতুর্দ্দশ দেবতার পরিত্যক্ত মন্দির রূপে চিহ্নিত করেন।[১৭]

কিন্তু মন্দিরের শিলালিপি প্রমাগ করে যে মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ১৫৭২ শকাব্দের (১৬৫০ খৃঃ) আষাঢ় মাসে এই মন্দির নির্মাণ করে গোপীনাথের উদ্দেশ্যে দান করেন।[১৮] শ্রীরাজমালার পাঠও শিলালিপি সমর্থন করেন।

গোপীনাথ মন্দির ইতিহাসের সাক্ষী

"চন্দ্র গোপীনাথ মূর্ত্তি চাটিগ্রামে ছিল।
অমর মাণিক্য কালে মঘে নিয়াছিল॥
সেই দেব চট্টল হইতে আনিয়া তখন।
সেই মঠে স্থাপে বিষ্ণু করিয়া অর্চন॥"[১৯]

এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা আমি "রাজগী ত্রিপুরার প্রাচীন মন্দির প্রসঙ্গে" নামক গ্রন্থে করেছি।[২০] পূর্বপুরুষ ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ত্রিপুরবংশধর কল্যাণদেবের পক্ষে ত্রিপুর-রাজবংশের কুলদেবতা চতুর্দ্দশ দেবতাদের বাস্তুচ্যুত করে সেই মন্দিরে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা অবাস্তব ও পূর্বপুরুষদের সম্মান হানিকর। এরূপ কাজ তিনি কখনই করতে পারেন না। অপর দিকে তাঁর বংশধররাও তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথকে উচ্ছেদ করে সেখানে চতুর্দ্দশ দেবতাদের বসাবেন এমনটি ভাবাও অবাস্তব।

গোপীনাথ মন্দির

(ঘ) কৃষ্ণ প্রস্তরের বিষ্ণুমন্দির ঃ (জগন্নাথের দোল) ? (১৬৬১ খৃঃ) ঃ–

জগন্নাথ দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোনে কাল স্লেট পাথরের একটি পরিত্যক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির দেখা যায় এটিই ত্রিপুরার একমাত্র পাথরের তৈরী মন্দির। এই মন্দিরের স্থানীয় নাম "জগন্নাথের দোল"। বস্তুতঃ মন্দিরের সামনে একটি ছন বাঁশের তৈরী কুঁড়ে ঘরে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার মূর্ত্তি পূজা হয়ে থাকে রীতিমত।

কিন্তু এই জগন্নাথ স্থাপন নিশ্চয়ই পরবর্তী কালের ঘটনা কারণ পাথরের মন্দিরের শিলালিপি প্রমাণ করে যে উক্তমন্দির নির্মাণ করান কল্যাণ মাণিক্যের পুত্রদ্বয় মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও জগন্নাথ দেব এবং ১৫৮৩ শকাব্দের কার্তিক পূর্ণিমাতে তাঁদের মাতা সহরবতীর স্বর্গলাভ কামনায় এই মন্দির বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।[২১]

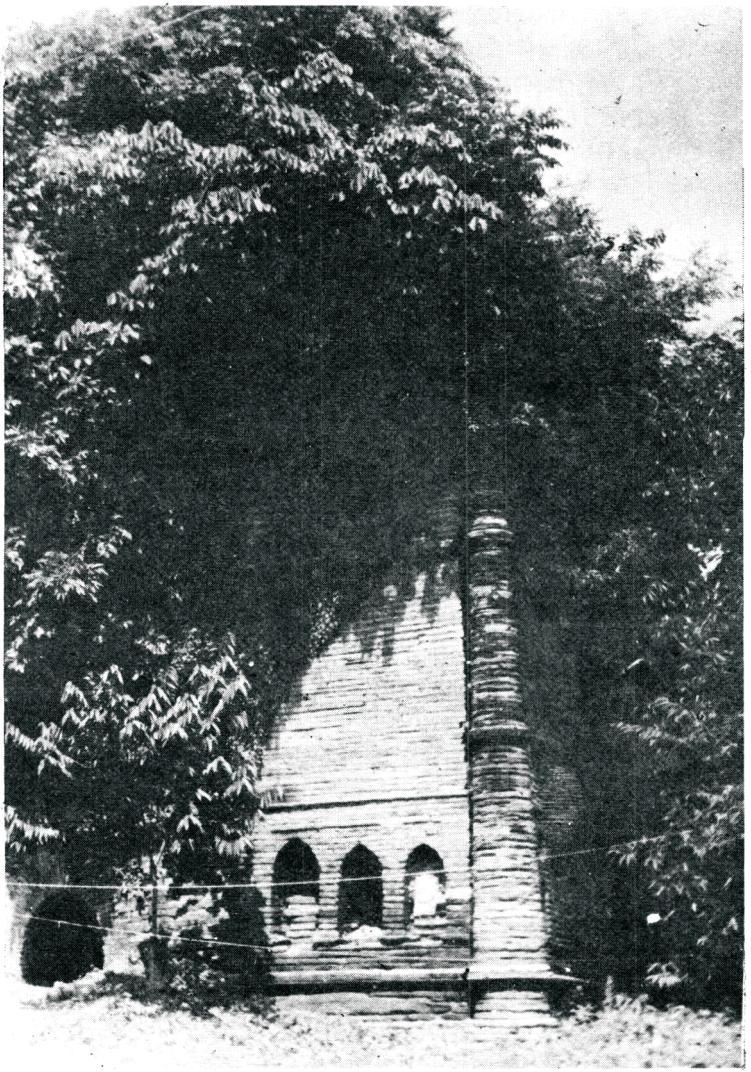

গোবিন্দমাণিক্যের বিষ্ণু মন্দির

(ঙ) **গুণবতী মন্দির গুচ্ছ** (১৬৬৮ খৃঃ) ঃ–

মহাদেব বাড়ী থেকে বদর মোকামের পথে কিছু দূর গিয়ে রাস্তার বাম পাশে তিনটি মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরগুলি গুণবতী মন্দির গুচ্ছ বলে পরিচিত। গুণবতী মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের মহারাণী। এই তিনটি মন্দিরের মধ্যে পশ্চিম দিকের মন্দিরটি পূব-মুখী। এই মন্দিরের পেছনের দেয়ালে প্রাপ্ত শিলালিপির সাক্ষ্যে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৫৯০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী গুণবতী ঁবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।[২২] ১৬৬৮ খৃঃ গোবিন্দ মাণিক্যের দ্বিতীয় বারের রাজত্বকালের মধ্যে পড়েছে। বাকী দুইটি মন্দিরের একটি পশ্চিমদ্বারী ও অপরটি দক্ষিণদ্বারী। এই মন্দিরগুলিতে শিলালিপি নেই ; তাই পরিচয় জানা যাচ্ছে না। শ্রীরাজমালা সম্পাদক লিখেছেন–"এই মন্দিরদ্বয় ও মহারাণীর নির্মিত বলিয়া স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস।"[২৬] কিন্তু শুধুমাত্র স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া যায় কি ?

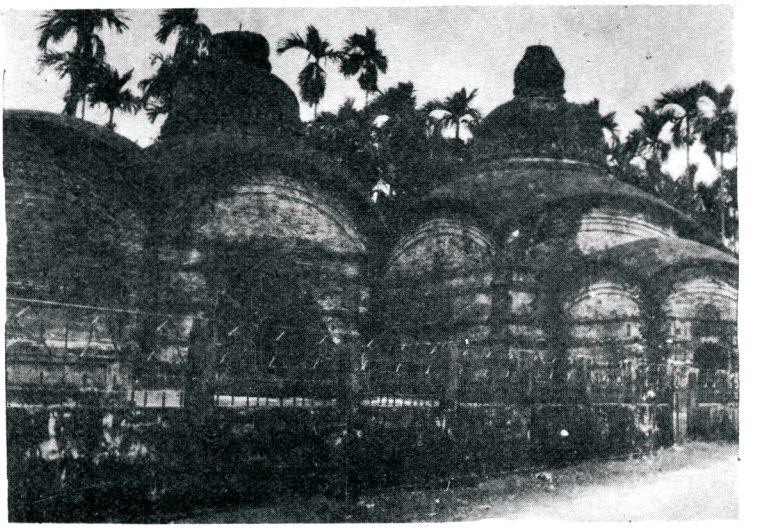

গুণবতী মন্দিরগুচ্ছ

(চ) **রামদেবের বিষ্ণুমন্দির** (১৬৭৩ খৃঃ) ঃ–

মহাদেব বাড়ী মন্দিরগুচ্ছের তৃতীয় মন্দিরটি গোপীনাথ মন্দিরের পশ্চিম পাশে অবস্থিত। শ্রীরাজমালা সম্পাদক এই মন্দিরটি মুকুন্দমাণিক্য কর্তৃক তৈরী ঁবৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[২৪] কিন্তু মন্দিরের শিলালিপি প্রমাণ করে যে গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামদেব ১৫৯৫ শকাব্দে (১৬৭৩ খৃঃ) এই মন্দির নির্মাণ করে

বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।[৪] শিলালিপি সংগ্রহকারক বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ১৫৯৫ শকাব্দে রামদেবকে ত্রিপুরার "মাণিক্য" বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৫৯৫ শকাব্দে রামদেব যুবরাজ ছিলেন।

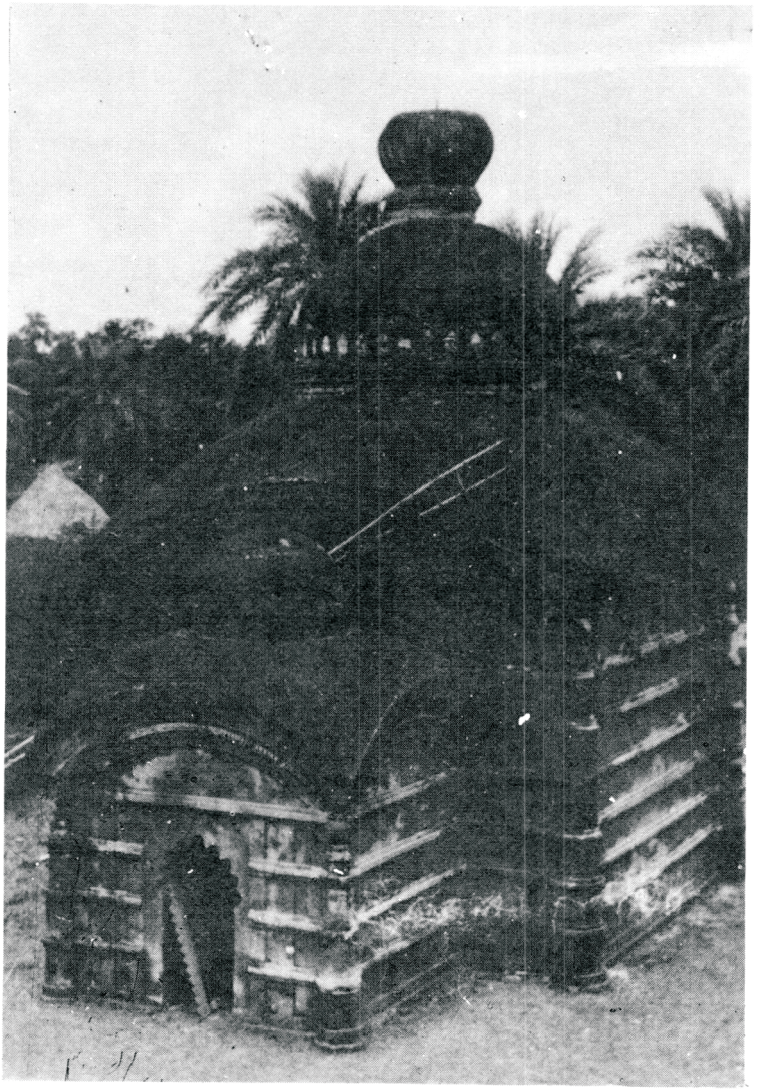

গোপীনাথ মন্দির

(ছ) **রামমাণিক্যেরবিষ্ণুমন্দির** (১৬৭৭ খৃ) ঃ–

পুরাতন রাজবাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি মন্দির বেশ ভাল অবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরটি পূর্বমুখী। এই মন্দিরটিকেই 'বিসর্জন'খ্যাত ভুবনেশ্বরীর মন্দির বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু মন্দির গাত্রে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে মন্দিরটি নির্মাণ করান রামদেবমাণিক্য ১৫৯৯ শকাব্দে (১৬৭৭ খৃঃ), তাঁর পিতা গোবিন্দ মাণিক্যের স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিষ্ণুকে উৎসর্গ করেন।[২৬] কাজেই এটি একটি বিষ্ণু মন্দির।

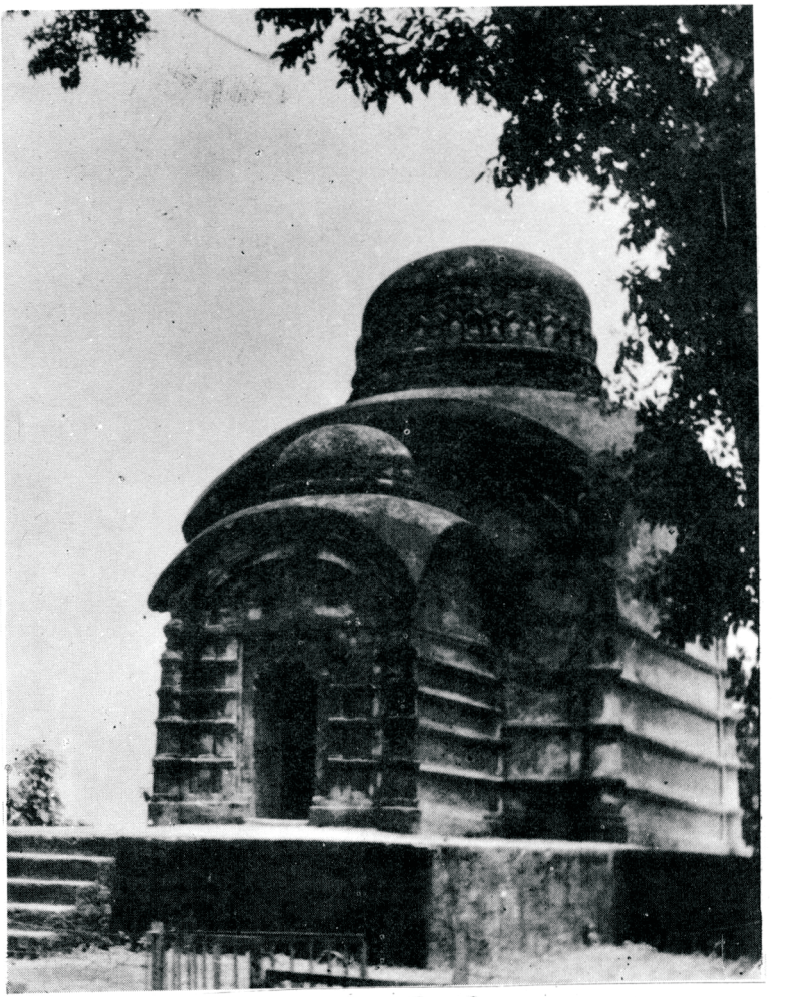

রাম মাণিক্যের বিষ্ণু মন্দির

(জ) **২য় রত্নমাণিক্যের কালের বিষ্ণুমন্দির** (সঃ তাঃ ১৬৮৫-১৭১২ খৃঃ) ঃ–

পুরাতন রাজবাড়ীর দক্ষিণপূর্ব কোনে রয়েছে একটি মন্দির । এই মন্দিরের শিলালিপির বেশ কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেছে ফলে পুরো লিপিটি পড়া যায় না । শিলালিপির চতুর্থ পংক্তিতে "ভূপাল মহিষী ধন্যা সতী রত্নাবতী বরা" আর পঞ্চম পংক্তিতে "প্রীতয়ে হরে"–দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে এই মন্দির নির্মাণে রত্নাবতী নামে কোন মহিলা যুক্ত ছিলেন । শ্রী রাজমালা সম্পাদকের মতে রত্নবতী ২য় রত্নমাণিক্যের পত্নী এবং এই মন্দির তিনিই নির্মাণ করান ।২৭ কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী রত্নমাণিক্যের রত্নাবতী নামে কোন রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়না । আর 'প্রীতয়ে হরে' দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে মন্দিরটি হরির প্রীতির জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল । ২য় রত্নমাণিক্য গোবিন্দমাণিক্যের পৌত্র এবং তাঁর রাজত্বকালে ১৬৮৫-১৭১২ খৃঃ পর্যন্ত ।

রত্নমাণিক্যের কালের বিষ্ণু মন্দির

(ঝ) **দুত্যার বাড়ী মন্দির গুচ্ছ** (১৬৯৯ খৃঃ) ঃ–

মহাদেব বাড়ী মন্দিরগুচ্ছের পূব দিকে আর একটি প্রাচীরের মধ্যে দুইটি পরিত্যক্ত মন্দির রয়েছে । মন্দিরগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়, বিশেষ করে মন্দিরগুলির সামনে বর্তমানে "রাধামাধব মন্দির" নির্মাণ করার ফলে প্রাচীন কীর্তি দুইটি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে । স্থানীয় লোকেরা এই প্রাচীন স্থানটি "দুত্যার বাড়ী" বলে অভিহিত করেন । 'দুত্যা' শব্দটি দৈত্য বা 'দ্বিতীয়া' এই দুইটি শব্দের অপভ্রংশ হতে পারে । দুত্যার বাড়ী মন্দিরগুচ্ছের পূবদিকের মন্দিরটিকে আর মন্দির বলে চেনা যায় না । ইঁটের পাঁজা হয়ে একেবারে বিলুপ্তির অপেক্ষা করছে । উক্ত

মন্দিরের শিলালিপির পাঠ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উদ্ধার করতে অসমর্থ হয়েছিলেন।[২৮] কিন্তু ডঃ দিনেশ চন্দ্র সরকার কিঞ্চিৎ পাঠ উদ্ধার করতে পেরেছেন। তিনি "দ্বিতীয়া" শব্দটি এবং শকাব্দ "১৬২১" পড়তে সমর্থ হয়েছেন।[২৯] শক ১৬২১ অর্থাৎ ১৬৯৯ খৃঃ দ্বারা ২য় রত্নমাণিক্যের কাল বুঝাচ্ছে। তাঁর রাজত্বকালে দুই জন দ্বিতীয়া দেবীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। প্রথমজন রত্নমাণিক্যের মাতুল বলিভীম নারায়ণের কন্যা দ্বিতীয়া দেবী আর দ্বিতীয় জন গোবিন্দমাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ দেবের কন্যা দ্বিতীয়া দেবী। প্রথম জন রত্নমাণিক্যের মামাত বোন আর দ্বিতীয় জন পিসী ঠাকুরাণী। শিলালিপিতে "দ্বিতীয়া" শব্দের উল্লেখদ্বারা এই দুই জনের যে কোন একজন মন্দিরের নির্মাতা বলে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে কিন্তু শিলালিপির পুরা পাঠ উদ্ধার করা যায়নি বলে মন্দিরটি কোন দেবতার তা জানা গেল না।

(ঞ) **ধন্যমাণিক্যের বিষ্ণুমন্দির ঃ** (সঃ ১৪৯০-১৫২০ খৃঃ) ঃ–

ফুলকুমারী মৌজায় ধন্যসাগরের পূব পাড়ে একটি উঁচু স্থানের উপর একটি মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরের গঠন একটু অন্য ধরনের ছিল বলে মনে হয় কারণ ইহাতে অনেকগুলি কোন দেখতে পাওয়া যায়। গাথুনী পরিস্কার ও সুন্দর এবং ইটের উপরে আস্তরের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। এই সৌধ ষোলকোনাদালান নামে পরিচিত। বর্তমানে একেবারে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এ সৌধ কে তৈরী করান তা অনুমান করা কঠিন কারণ রাজমালাতে ষোলকোণা দালানের কোন উল্লেখ নেই। ৫০-৬০ বৎসর পূর্বে কেউ কেউ দালানের কোনগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন এরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। নিকটেই রয়েছে একটি মন্দির। ২০-২৫ বৎসর পূর্বেও কেবলমাত্র মন্দিরের দরজা খানা দেখেছিলাম, বাকী অংশ বটবৃক্ষমূলে ঢেকে রেখেছিল। এটিই সম্ভবতঃ ধন্যমাণিক্য কর্তৃক নির্মিত একটি বিষ্ণুমন্দির। রাজমালাতে উল্লেখ আছে–

"পরে বিষ্ণুমঠ রাজা করিল নির্মাণ।
বেদ বিধি মতে কৈল দেব সম্প্রদান॥"[৩০]

ধন্যমাণিক্য আরও একটি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু সে মন্দিরে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা না করে দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করেছি।

(ট) **হরি মন্দির ঃ** (সঃ অঃ ১৪৯০-১৫২০ খৃঃ)

জগন্নাথ দীঘির পূবপাড়ে দেউড়ি সহ একটি প্রাচীন মন্দির পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় লোকেদের নিকট উহা হরিমন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরের ভেতরের বেদী ও দরজার সামনে নাম ফলকের খালি স্থান দেখা যায়। শিলালিপির অভাবে প্রকৃতপক্ষে এই মন্দির কে তৈরী করিয়েছিলেন বা কোন দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা জানা যাচ্ছে না। ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের উপরের জঙ্গল ও আবর্জনা পরিষ্কার করে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের একখানা ছবি স্থাপন করা হয়। প্রসিদ্ধ বারদির ব্রহ্মচারী মহারাজের শিষ্য বরদাকান্ত নাগ মহাশয় একটি আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে উদয়পুরে এসেছিলেন। হরিমন্দিরের শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের ছবিটি

উক্ত নাগ মহাশয় দান করেছিলেন। বর্তমানে এই মন্দির পুণরায় পরিত্যক্ত মন্দিরে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ধন্যমাণিক্য চারখানা মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন বলে শ্রী রাজমালা জানাচ্ছে। "শ্রী ধন্যমাণিক্য চারি মঠ দিল ক্রমে"।[৩২] প্রথমমঠে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আমরা আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় বিষ্ণুমঠে ত্রিপুরাসুন্দরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তৃতীয় মঠে চতুর্দ্দশ দেবতা স্থাপন করেছিলেন এবং যার সন্ধান আমরা পাইনি। তাহলে ৪র্থ মঠ বিষ্ণুমন্দির, এটি কি বর্তমানের হরিমন্দির ?

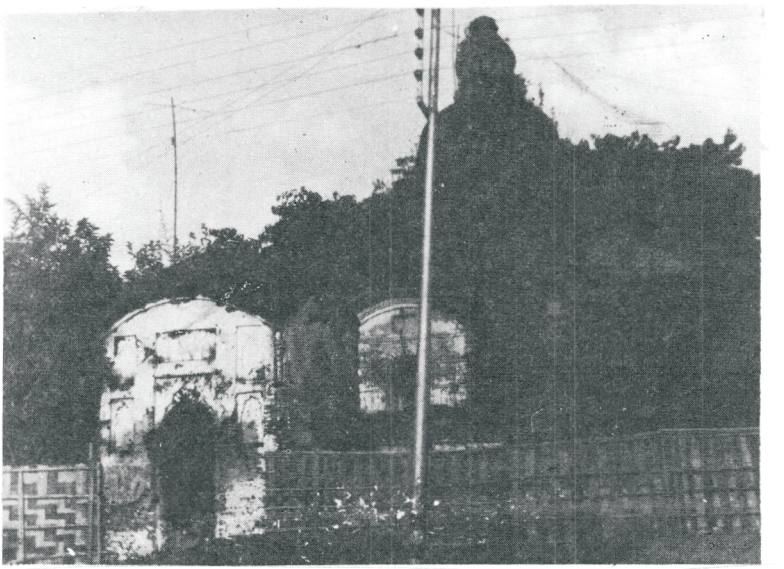

হরি মন্দির

(ঠ) দৈত্যনারায়ণের জগন্নাথ মন্দির (সঃ ১৫৩২-৪০ খৃঃ) ঃ–

দুত্যার বাড়ী প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এবারে দৈত্য নাম নিয়ে ভাবা যাক। দৈত্য নামে তিনজন রাজপুরুষ বা রাজার সন্ধান পাই তাদের মধ্যে ২য় বিজয় মাণিক্যের শ্বশুর ও সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুরুষ ছিলেন। রাজমালা তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে–

"দত্য নারায়গে জগন্নাথ মূর্ত্তি যানে।
মঠেত স্থাপনা কৈল পাইয়া পূণ্য দিনে ॥[৩২]

স্থানের নাম দৈত্যের বাড়ী ধরলে পশ্চিম দিকের দক্ষিণ দ্বারী মন্দিরটি দৈত্যনারায়ণ স্থাপিত জগন্নাথ মন্দির হতে পারে। অবশ্য শিলালিপির অভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান বিভ্রান্তি জনক।

(ড) গুণ্ডিচা বাড়ী (সঃ ১৫৩২-৪০ খৃঃ ?) ঃ–

জগন্নাথ দীঘির উত্তর পূর্ব কোনে গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে একটি মন্দির একেবারে নদীগর্ভে বিলীন হতে চলছে। মন্দিরটি কাত হয়ে নদীর দিকে ঝুলে আছে এবং অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বর্তমানে মন্দিরটির সামনের প্রাঙ্গণে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফলে পেছনের প্রাচীন মন্দিরটি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেছে। শ্রীরাজামালা সম্পাদক মন্দিরটি গুণ্ডিচা বাড়ী বলে ধারণা করেছেন।[৩৩] মন্দিরে শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। সেজন্য কাল নির্ণয় ও মন্দিরের নাম নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। যদি মন্দিরটি গুণ্ডিচা মন্দির হয়ে থাকে তাহলে খুব সম্ভবতঃ সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ মন্দিরটির নির্মাতা। এই দৈত্যনারায়ণ ২য় বিজয়মাণিক্যের শ্বশুর ও সেনাপতি। দৈত্যনারায়ণ উদয়পুরে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করে, উড়িষ্যা থেকে জগন্নাথ মূর্তি এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং বার মাসে বার যাত্রার প্রচলন করেছিলেন।

(ঢ) চন্দ্রপুরের গোপীনাথ মন্দির (সঃ তাঃ ১৫৬৭-১৫৭৩ খৃঃ) ঃ–

ত্রিপুরাসুন্দরীর বাড়ীর দক্ষিণদিকে উদয়পুর-সাব্রুম রাস্তার ডান পাশে চন্দ্রসাগর নামক দীঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। রাজমালার বিবরণ অনুযায়ী এই মন্দির নির্মাণ করান উদয়মাণিক্য (১৫৬৭-১৫৭৩ খৃঃ)। উহা গোপীনাথ মন্দির।

"বহুল করিয়া জত্ন এক মঠ দিল।
চন্দ্রগোপীনাথ নাম শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিল ॥[৩৪]

উদয়মাণিক্যই উদয়পুরের নামাকরণ করেন। মন্দিরে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। মন্দিরের অবস্থা খুবই শোচনীয় কিন্তু একটি তোরণ বেশ দেখতে, কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজধর মাণিক্যের বিষ্ণু মন্দির (সঃ তাঃ ১৫৮৬-১৫৯৯ খৃঃ)

(ণ) পুরাতন রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে একেবারে গোমতী নদীর ধারে একটি মন্দির ছিল। উহা ১ম রাজধর মাণিক্যের মন্দির বলে পরিচিত ছিল। এই মন্দিরের কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে শ্রীরাজমালাতে উল্লেখ আছে যে–

"বিষ্ণুর মন্দির দিতে রাজার মনের আশয়॥
নির্মিল মন্দির এক বিচিত্র আকার।
বিষ্ণুপ্রীতে উৎসর্গিল স্বহস্তে রাজার॥"[৩৫]

মন্দিরটি গোমতীর এত কাছে অবস্থিত ছিল যে মন্দির পরিক্রমা কালে ভাবে বিহ্বল রাজা গোমতীতে পড়ে যান এবং প্রাণত্যাগ করেন। ১৯৩১ খৃঃ শ্রীরাজমালা সম্পাদক লক্ষ্য করেছেন–"এই জীর্ণ কলেবর দেবায়তন এখনও বর্তমান আছে, সংস্কার না হইলে আর অধিককাল স্থায়ী হইবার আশা নাই।"[৩৬] ১৯৫০ খৃঃ আমি দেখেছি যে মন্দিরটি গোমতীতে কাত হওয়া অবস্থায়। বর্তমানে মন্দিরের কোন চিহ্ন নেই, নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

(৩) **বদরমোকামঃ** (সঃ তাঃ ১৬২১-২৪ খৃঃ) ঃ–

মহাদেব বাড়ী মন্দির গুচ্ছের সামনে দিয়ে যে রাস্তা পূবদিকে গেছে তা বদরমোকাম খেয়াঘাটে মিলেছে। এই খেয়াঘাটের ডানপাশে একটি ইটের তৈরী দোচালা ঘরের মত কবরস্থান আছে। ইহা বদরসাহেবের দরগাহ নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে আওলিয়া বদর সাহেবের যথেষ্ট প্রভাব ও নানা কীর্তি রয়েছে। উদয়পুরে মুসলমান প্রভাব বৃদ্ধির ফলে সম্ভবতঃ বদর সাহেবের এখানে আসেন। আতারাম ও বুধিরাম নামক দুই হিন্দু নরসুন্দর বদর সাহেবের অলৌকিক মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন বলে কথিত আছে।[৩৭] দরগার বর্তমান খাদিমগন আতারাম ও বুধিরামের বংশধর বলে দাবী করেন। এই দরগার চেরাগ দেবার জন্য রাজসরকার হতে "চেরাগী মিনাহ" ভূমি দান করা হয়েছিল। বর্তমানে ঐ সনন্দের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। এই মোকামে ১লা বৈশাখে মেলা বসে। বস্তুতঃ বর্তমানে এই দরগাহ হিন্দুমুসলমানের মিলন ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

(থ) **মোগল মস্‌জিদ** (সঃ তাঃ ১৬২১-২৪ খৃষ্টাব্দে) ঃ–

বদর মোকামের খেয়াঘাট থেকে পুরাতন রাজবাড়ী যাবার পথের ডান পাশে টিলার পাদদেশে একটি ছাদবিহীন অসম্পূর্ণ মসজিদের ভগ্নস্তুপ দেখা যায়। এটি মোগল মসজিদ নামে পরিচিত। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে মোগলবাহিনী উদয়পুর দখল করে এবং যশোধর মাণিক্যকে বন্দী অবস্থায় রাজ্যত্যাগ করতে বাধ্য করে। যশোধরের রাজ্যত্যাগ ও কল্যাণমাণিক্যের সিংহাসন আরোহণের মধ্যবর্ত্তী আড়াই বৎসর উদয়পুরে মোগল শাসন চলেছিল।[৩৮] সম্ভবতঃ এই সময়ে এই মস্‌জিদ নির্মাণ শুরু হয় কিন্তু উদয়পুরে মহামারী শুরু হওয়ায় মোগলগণ দ্রুত উদয়পুর ছেড়ে মেহেরকুলে চলে যায়

ফলে মস্‌জিদের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই অসমাপ্ত ধর্মস্থান আজও ইতিহাসের সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

(দ) **কল্যাণমাণিক্যের দোলমঞ্চ** (সঃ তাঃ ১৬২৫-১৬৬০ খৃঃ) ঃ–

বদর মোকামের পথে গুণবতী মন্দিরগুচ্ছ ছাড়িয়ে রাস্তার ডানপাশে একটি ভগ্নবাড়ী দেখা যায়। বাড়ীটি দেখতে দোলমঞ্চের মত। এটিই কি কল্যাণ মাণিক্যের দোলমঞ্চ ?

"নিজপুর সম্মুখেতে ছিল একস্থান।
বিষ্ণুর আলয় তাতে করয়ে নির্ম্মাণ॥
দোল মঞ্চ নির্মাইল তার পূর্বদিকে।
দুর্গাগৃহ নির্মাইল সন্নিকট ভাগে॥"[৩৯]

এই পদ্যপাঠ শ্রী রাজমালার কিন্তু রাজমালাতে কেবল নিজপুরী ও বিষ্ণুর জন্য আলয় নির্মাণের কথা আছে। যথা–

"তবে রাজা কল্যাণ মাণিক্য নৃপবর।
নিজপুরী করিলেক পরম সুন্দর॥"

এবং

"নিজপুরী সম্মুখেতে ছিল একস্থান।
তাহাতে বিষ্ণুর পুরী করিছে নির্ম্মাণ॥"[৪০]

দুর্গা বাড়ী তৈরীর কথা রাজমালাতে উল্লেখ নেই কিন্তু আসামের দূতগণ দুর্গামন্দির প্রত্যক্ষ করেছেন। বস্তুতঃ বদরমোকামের পথের ডান দিক ও মহারাণী যাবার প্রাচীন পথের ডান পাশের মধ্যবর্তী সমতল জমিতে ইটের টুকরার প্রাধান্য এত বেশী যে এখানে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু বর্তমানে জনবসতিতে সব কিছু লোপ পেয়েছে।

দোলমঞ্চ দ্বিতল গৃহ। নীচের তলার প্রকোষ্ঠগুলি পরিষ্কার বুঝা যায়। "উপরের তলায় দোচালা ঘরের মত প্রকোষ্ঠের উপরিভাগে চার কোণে লৌহ নির্মিত আংটা সংযুক্ত ছিল। ঐরূপ একটির চিহ্ন এখনও আছে।"[৪১] স্থানীয় লোকের এই সৌধকে "লুকপলানীর দালান" ও (লুকোচুরী) বলে। ঝুলন মঞ্চের পাশাপাশি আরও দুইটি মন্দির রয়েছে। একটি বিষ্ণু মন্দির ও অপরটি দুর্গামন্দির বলে অনুমান করা যেতে পারে। শিলালিপির অভাবে স্থির সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত। সম্ভবতঃ এই এলাকাতেই মন্দিরগুলিকে সামনে রেখে কল্যাণমাণিক্য "নিজপুরী" নির্মাণ করেছিলেন।

(ধ) **ধর্মরাজের মন্দির (ধর্মমঠ)** (সঃ তাঃ ১৬২৫-১৬৬০ খৃঃ) ঃ–

বর্তমানে চকবাজারের পূবধারে নিউ টাউন রোডের বাম পাশে ধর্মাশ্রম নামক স্থানে দুইটি প্রাচীন মন্দির পাশাপাশি রয়েছে। একেবারে ধ্বংসমুখী মন্দিরগুলি বাজারের দোকানীদের পশরার আড়ালে কোনরূপে মাথাগুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটির ধর্মাশ্রম নামের মাহাত্ম্যে মনে হয় মন্দিরগুলির কোন একটি ধর্ম মন্দির। রাজমালার কল্যাণ মাণিক্য খণ্ডে বর্ণিত আছে–

"তার বাম ভাগে রাজা আর মঠ দিল।
বহু জত্ন করি ধর্ম্ম সম্প্রদান কৈল ;
ধর্মমঠ বলি নাম রাখিল তাহার।
নিত্য ২ দান রাজা করিছে অপার ॥"[৪২]

বর্ণনা মতে পশ্চিমদিকের মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দির আর পূবদিকের মন্দিরটি ধর্মমন্দির বা ধর্মমঠ। কিন্তু শিলালিপির অভাবে প্রকৃত পরিচয় জানা যাচ্ছে না।

(ন) গোবিন্দমাণিক্যের বাড়ীর (?) পার্শ্বস্থ মন্দির (সন বিহীন) ঃ–

বদরমোকাম পথে আরও এগিয়ে নিয়ে রাস্তার বাম পাশে খানিকটা দূরে গোমতী নদীর ধারে দুইটি মন্দির রয়েছে। মন্দিরগুলি উত্তরমুখী। মন্দিরগুলিতে কোন শিলালিপি নেই। সেজন্য কবে তৈরী হয়েছে, কে তৈরী করিয়েছেন বা কোন দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছিল ইত্যাদি কিছুই জানা যাচ্ছে না। শ্রী রাজমালা সম্পাদক বর্ণিত গোবিন্দমাণিক্যের তথাকথিত প্রাসাদের (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন) পূবধারে মন্দিরগুলি অবস্থিত।

(প) বৈকুণ্ঠ পুরী (সন বিহীন) ঃ–

ত্রিপুরার রাজাদের শ্মশানভূমির নাম বৈকুণ্ঠপুরী। বৈকুণ্ঠপুরীতে অনেক ত্রিপুর নরপতির শেষকৃত্য সম্পন্ন হবার বিবরণ রাজমালাতে আছে। এই বৈকুণ্ঠপুরী কোথায় ছিল ? পুরাতন রাজবাড়ীর কিছু পশ্চিমে গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে একটি বিস্তৃত শ্মশান ভূমি "গৌতমমুনির চর" নামে পরিচিত। কেউ কেউ মনে করেন এটিই রাজকীয় শ্মশানভূমি। পিত্রা ছড়া যেখানে গোমতী নদীতে মিশেছে সেখানে গোমতীর উভয় তীরে অনেকগুলি মঠ ছিল। কিছু কিছু মঠে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। নদীর সঙ্গমস্থলে অনেক ছোট বড় মঠ, ভেতরে স্থাপিত শিবলিঙ্গ স্বভাবতঃই বৈকুণ্ঠপুরীর কথা মনে করিয়ে দেয়। সেলকালে সাধারণ লোকের দাহ স্থানে মঠ তৈরী খুব সম্ভবতঃ সম্ভব ছিল না। সেজন্যই এই স্থান বৈকুণ্ঠপুরী হতেও পারে। ধন্যমাণিক্যের ষোলকলা দালানকে কেউ কেউ বৈকুণ্ঠপুরী বলে মনে করেন। তবে ধন্য সাগরের মত বৃহৎ দীর্ঘির পাড়ে যেখানে প্রচুর লোকের বাস সেখানে শ্মশানভূমি রচনা না করাই স্বাভাবিক বিশেষকরে খুব কাছেই রয়েছে নদীস্রোত। মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য (১৮২৬-১৮২৯ খৃঃ) রাজধানী আগরতলা ত্যাগ করে উদয়পুরে বসবাস করেন। এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।[৪৩] তাঁর দেহাবশেষ যে স্থানে দাহ করা হয় তা কাশীমাণিক্যের শ্মশান বলে পরিচিত। জগন্নাথ দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণদিয়ে পশ্চিমমুখী একটি পথ রাজার বাগ গ্রামে গেছে। ঐ পথের ডান পাশের আমবাগান রাজার বাগিচা স্মৃতি বহন করছে এবং নিকটবর্তী শ্মশানভূমি জনবসতিতে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু কাশীমাণিক্যের শ্মশান বৈকুণ্ঠপুরী নয়। সম্ভাবনার দিক থেকে পিত্রাছড়াও গোমতীর সঙ্গম স্থলই বৈকুণ্ঠপুরীর স্থান বলে মনে হয়।

–ঃ পাদটীকা ঃ–

১। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঃ পূর্বেউল্লিখিত, পৃঃ ৪০ ।

২। শ্রীরাজমালা, ২য় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৮২ ।

৩। তদেব, পৃঃ ১৭৮ ।

৪। তদেব, পৃঃ ৬৬ ।

৫। তদেব পৃঃ ৬৮ ।

৬। শ্রীরাজমালা, ৪র্থ লহর, পৃঃ ১৬৫ ।

৭। পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৬৪ ।

৮। শ্রীরাজমালা, ৪র্থ লহর, পৃঃ ১৭০ ।

৯। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪০ ।

১০। তদেব ঃ পৃঃ ৬৮ ।

১১। বিদ্যাবিনোদ চন্দ্রোদয় ঃ শিলালিপি সংগ্রহ, আগরতলা, ১৯৬৮, পৃঃ ৩ । (পরে শিলালিপি)।

১২। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৮-২৯ ।

১৩। রমেশচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪৯০ ।

১৪। মুখোপাধ্যায় সুখময় ঃ বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল. কলিকাতা-১৯৬২ পৃঃ ২৩১ ।

১৫। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩২ ।

১৬। শিলালিপি, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১১ ।

১৭। শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৬৬ ।

১৮। শিলালিপি, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৩ ।

১৯। শ্রীরাজমালা, ৩য় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৭২ ।

২০। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঃ রাজর্ষী ত্রিপুরার প্রাচীনমন্দির প্রসঙ্গে, কলিকাতা, ১৯৮৮ ইং, পৃঃ ২২-২৪ ।

২১। শিলালিপি, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৬ ।

২২। তদেব, পৃঃ ১৯ ।

২৩। শ্রীরাজমালা, ৪র্থ লহর, পৃঃ ৯২ ।

২৪। তদেব, পৃঃ ১০৮ ।

২৫। শিলালিপি, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৬ ।

২৬। তদেব, পৃঃ ২১ ।

২৭। শ্রী রাজমালা, চতুর্থ লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৯৮ ।

২৮। শিলালিপি, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৭ ।

২৯। সরকার দিনেশচন্দ্র ঃ সাম ইপিগ্রাফিক্যাল রেকর্ডস অব দ্য মেডিয়াভেল পিরিয়ড ফ্রম ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৭৯, পৃঃ ১১২ (পরে দিনেশ চন্দ্র) ।

৩০। রাজমালা পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩১ ।

৩১। শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩২ ।

৩২। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩৪ ।
৩৩। শ্রীরাজমালা, ৪র্থ লহর, পৃ ৯১ ।
৩৪। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪৬ ।
৩৫। শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয়লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৫৩ ।
৩৬। শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৬৩ ।
৩৭। তদেব, পৃঃ ২১৮ ।
৩৮। তদেব, পৃঃ ২৩৭ ।
৩৯। তদেব, পৃঃ ৭৬ ।
৪০। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৭০-৭৪ ।
৪১। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র : পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৮ ।
৪২ । রাজমালা, পূর্বে-উল্লিখিত, পৃঃ ৭৪ ।
৪৩। কৈলাসচন্দ্র : পূর্বে উল্লিখিত, ২য়ভাগ, ১৪শ অধ্যায়, পৃঃ ১৬০ ।

একাদশ অধ্যায়

নাগরিকের সাধারণ স্বাস্থ্য

চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত ত্রিপুর-রাজধানী উদয়পুরের জল হাওয়া কেমন ছিল ? এত দীর্ঘ কাল ধরে কোন রাজ্যের রাজধানী কোন অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকতে পারে না একথা সহজেই অনুমান করা যায় । প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুর-রাজগণ মাঝে মাঝে এখানে সেখানে সাময়িক রাজাবাস গড়ে তুললেই উদয়পুরই ছিল স্থায়ী রাজধানী । ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রাজধানী পরিত্যাগ করতে হয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য নয়, বিদেশী আক্রমণ ও লুটপাটের ফলে শক্তিহীন ত্রিপুর রাজ সমসের গাজীর বাহুবলে রাজধানী থেকে পলায়ন করেছেন । পলায়ন তাঁর পূর্বপুরুষরাও করেছিলেন আবার সুযোগ মত ফিরে এসেছেন কিন্তু কৃষ্ণমণি যুবরাজ আর ফিরে আসেন নি । রাজধানীর গুরুত্ব হারাবার পরে উদয়পুর জনশূন্য হল । ক্রমে ঘন বন জঙ্গল নগরী দখল করল । ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরে জঙ্গল আবাদ করে নূতন করে প্রজাপত্তন করার শুরু করেন রাজসরকার ।[১] ঐ সময়ে জঙ্গল পরিষ্কার করার ফলে মূল শহরের চারপাশে অনেক পুরাতন জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া যায় । কিছু কিছু প্রাচীন জলাশয় ভরাট হয়ে একেবারে চাষের জমিতে পরিণত হয়ে যায় । বাকী জলাশয়গুলি আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল । এই জলাশয়গুলি স্বাভাবিক অবস্থায় রাজধানীর স্বাস্থ্য রক্ষায় নিশ্চয় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল ।

প্রচুর জনসংখ্যা বিশিষ্ট প্রাচীন রাজধানীতে জলাশয়গুলি যে কেবল পানীয় জলের অভাব মেটাত তা নয়, রাজধানীর নাগরিকদের সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও দীঘিগুলি প্রভাব ছিল প্রচুর । প্রচুর বৃষ্টিপাত, মাঝারীরকমের শীত ও গরম এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হলেও চারিদিকে দীঘিগুলির অবস্থানের জন্য সারা বছরধরে রাজধানীর আবহাওয়া স্নিগ্ধ মনোরম ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে । এই ধারণার সত্যতা প্রমাণ করে ১৬২২-২৩ খৃঃ ইব্রাহিম খাঁ ত্রিপুরা ভ্রমণ ।[২] ১৬২১ খৃঃ ত্রিপুরা বিজয়ের পর সেনাপতি মীর্জানুরুলা ও ইস্পান্দার খাঁ মারফৎ বঙ্গদেশের মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁ উদয়পুরের মনোরম আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খবর পান । ত্রিপুরা বুরঞ্জীতেও আসামের দূতগণ রাজধানীর অধিবাসীদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল লক্ষ্য করেছেন । পাহাড়ী অঞ্চলে পানীয় জল জীবনযাপনের সমস্যাকে কষ্টকর করে । দীঘিময় ত্রিপুর-রাজধানীতে দীঘিগুলি পানীয় জলের একমাত্র উৎস ছিল । কিন্তু কোন জলবাহিত রোগ বা মহামারীর খবর আমরা রাজমালা বা অন্যান্য সমসাময়িক পুস্তক বা বিবরণীতে পাইনা । ইসলাম খাঁ ভ্রমণের পর মোগলগণ রাজধানীতে চেপে বসে । শাসনযন্ত্র চলে যায় মোগলের হাতে । উদয়পুরকে মোগলসাম্রাজ্যের একটি থানাতে পরিণত করে মীর্জানুরুল্লাকে উদয়পুরের থানাদার নিযুক্ত করল । আরও ধনলাভের আশায় মোগলগণ দীঘিগুলি জনশূন্য করে ফেলল । রাজধানীতে জলাভাব

দেখা দিল, বাধ্য হয়ে নাগরিকগণ পানীয়রূপে নদীর নালার জল ব্যবহার করল এবং ফলে দেখা দিল মহামারী। মহামারীর প্রকোপে মোগলগণ রাজধানী ছেড়ে মেহেরকুল দুর্গে আশ্রয় নিল।[৩] এই মনুষ্য সৃষ্ট মহামারী ভিন্ন আর কোন মহামারীর বিবরণ রাজধানী পরিত্যাগ করার পূর্ব অবধি আমরা পাইনা। এতে মনে হয় রাজধানীর নাগরিকদের সাধারণ স্বাস্থ্য উল্লেখ করার মত খারাপ ছিল না।

রাজধানীতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হত। বেশ কয়েকটি ঘটনা রাজমালাকার নথীবদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক কালে মাণিক্য বংশীয় অন্ততঃ চারজন রাজা বসন্তরোগে প্রাণ হারান। তাহা হলেন মহামাণিক্য, ধর্মমাণিক্য, ধন্যমাণিক্য ও বিজয়মণিক্য (২য়)। নক্ষত্র মাণিক্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শ্রীরাজমালার মতে শিতলা দোষে তাঁর মৃত্যু ঘটে কিন্তু সমসাময়িক বিবরণী অন্যরূপ ধারণা দেয়।[৪] বসন্তের যে চিকিৎসা ছিল না বা চিকিৎসা করা হত না তা নয়। ২য় বিজয়মাণিক্য রোগাক্রান্ত ফলে কবিরাজগণ যথাসাধ্য চিকিৎসা করেও রাজার প্রাণ বাঁচাতে পারেননি।

"সাতচল্লিশ বৎসর বয়স হৈল জবে।
দৈবগতি রাজার শিতলা হৈল তবে॥
কবিরাজে চিকিৎসা করিল বহুতর।
তথাপি দারুণ রোগ না হৈল অন্তর॥
রোগেতে হৈল রাজা সরির জর্য্যর।
রামনাম স্মরণে তেজিল কলেবর॥[৫]"

স্বয়ং রাজার যেখানে এ অবস্থা সেখানে প্রজাদের অবস্থা কল্পনা করে নেয়া যায়।

—ঃ পাদটীকাঃ—

১। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩।
২। স্যার যদুনাথ, উল্লিখিত, পৃঃ ৩০২।
৩। শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৬৪।
৪। ত্রিপুরা, বুরঞ্জী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩৬।
৫। শ্রীরাজমালা, ২য়লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৭৩-৭৪।

দ্বাদশ অধ্যায়

দীঘিময় উদয়পুর

এককালে ত্রিপুরা রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, পরবর্তী কালে ত্রিপুর-রাজের জমিদারীর প্রধান শহর এবং বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম শহর কুমিল্লা ট্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কের জন্য বিখ্যাত ছিল। বস্তুত কুমিল্লা শহরের ট্যাঙ্কগুলি ত্রিপুর-রাজগণের কীর্তি যার সূচনা করেছিলেন প্রথম ধর্মমাণিক্য ১৩৮০ শকাব্দে।[১] কিন্তু তুলনা মূলক বিচার করলে দেখা যাবে যে কুমিল্লার চেয়ে অনেক বেশী দীঘি ত্রিপুর-রাজগণ পার্বত্যভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে খনন করিয়েছিলেন। বর্তমানে উদয়পুরের আশে পাশে অনেক দীঘি, জলাশয় দেখা যায়, কিছু দীঘি পুনর্সংস্কারের ফলে প্রাচীন রাজধানীর সৌন্দর্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ জলাশয় কেবল মাত্র নথির পাতায় বিরাজ করছে, বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। এই দীঘিগুলির ঐতিহাসিক মূল্যের কথা বাদ দিলেও প্রাচীন রাজধানীর স্মৃতিচিহ্নরূপে নিশ্চয়ই রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে। এই অধ্যায়ে দীঘিগুলির অবস্থান ও ইতিহাস সন্ধান করার চেষ্টা হচ্ছে। যথাসম্ভব কালানুক্রমিক ভাবে দীঘিগুলির পরিচয় পেশ করছি কেবলমাত্র একান্ত নথিপত্রের অভাবে কিছু কিছু জলাশয় তারিখ বিহীন বলে চিহ্নিত করা হবে।

(১) **ধন্যসাগর** (১৫১১-১৫১৩ খৃঃ সঃ) ঃ–

ফুলকুমারী মৌজায় অবস্থিত ধন্যসাগর এক বিরাট দীঘি। বহুকাল জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকার পর বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে। ধন্যমাণিক্য খণ্ডল দখল করার পরে বিজয় স্মারকরূপে এই দীঘি খনন করান। খননের কাজ চলে দুই বছর ব্যাপি। রাজমালার বর্ণনা অনুযায়ী ধন্যমাণিক্য এই দীঘির চারপাড়ে বিভিন্ন বর্ণের প্রজা পত্তন করেন।[২] এই ধন্য সাগরের পাড়ে নৃপতি প্রদত্ত ভোজে ত্রিপুরার 'কাঠিছোয়া' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে।

(২) **কমলা সাগর** (১৪৯০-১৫৩০ খৃঃ সঃ) ঃ–

উদয়পুর শহরের ৭।৮ মাইল পশ্চিমে কমলা সাগর নামক মৌজাতে এই দীঘি অবস্থিত। এই দীঘির পাড়ে পুরাতন দালানের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সম্ভবত ধন্যমাণিক্যের মহিষী কমলাদেবীর নামে এই দীঘির নামাকরণ করা হয়েছে কমলাদেবী নামের আর কোন মহারাণীর নাম রাজমালাতে পাওয়া যায় না। মুদ্রাসাক্ষ্যও প্রমাণ করে যে কমলাদেবী ধন্যমাণিক্যের রাণী।[৩] এই দীঘির পাড়ে প্রাপ্ত ইটে ১৪৪১ শকাব্দ লেখা পাওয়া গেছে। সেজন্যই দীঘিটি ধন্যমাণিকের আমলে খনন করা হয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। পরবর্তী কালে দীঘির নামানুসারে মৌজার নাম কমলাসাগর রাখা হয়।[৪]

(৩) ধ্বজমাণিক্যের দীঘি (১৫২০ খৃঃ সঃ) ঃ

উদয়পুরের নিকটবর্তী ধ্বজনগর গ্রামে একটি পুরাতন জলাশয়কে ধ্বজমাণিক্যের দীঘি নামে অভিহিত করা হয়। রাজমালাতে ধ্বজমাণিক্যের কোন উল্লেখ নাই। এই বিষয়ে পূর্বেই কিছু আলোচনা করেছি।[৫] উক্ত দীঘি ও পল্লীর নাম স্বভাবতই তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কোন রূপ মুদ্রা সাক্ষ্য ও পাওয়া যায়নি।

(৪) বিজয় সাগর (১৫৩২-১৫৬৩ খৃঃ সঃ) ঃ–

বিজয়সাগর বা মহাদেব দীঘি উদয়পুরের আর একটি বিশিষ্ট জলাশয়। মহারাজা বিজয়মাণিক্য এই দীঘি খনন করান ফলে শ্রী রাজমালা সম্পাদক উল্লেখ করেছেন।[৬] কিন্তু রাজমালার পদ্যপাঠে বিজয় সাগর খনন বিষয়ে কোন শ্লোক নেই। শ্রীরাজমালা সম্পাদক যে বিজয়মাণিক্যের উল্লেখ করেছেন তিনি নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্য কারণ প্রথম বিজয় মাণিক্যের অস্তিত্ব তখন ও জানা ছিল না। ত্রিপুরা বুরঞ্জীর সাক্ষ্য অনুযায়ী বিজয় সাগরের চার পাড়ে রাজধানীর বিশিষ্ট নাগরিকদের আবাসগৃহ ছিল।[৭]

(৫) চন্দ্রসাগর (১৫৬৭-১৫৭৩ খৃঃ সঃ) ঃ–

ত্রিপুরা সুন্দরীর বাড়ী হতে কিছুটা দক্ষিণে আগরতলা সাব্রম রাস্তার ডানপাশে একটি জলাশয় দেখা যায়। এই জলাশয়ের নাম চন্দ্রসাগর। সম্ভবতঃ চন্দ্রপুর গ্রামে খনিত হয়েছে বলে চন্দ্রসাগর নামকরণ হয়েছে। দীঘিটি খনন করান উদয়মাণিক্য। তিনি মাণিক্য রাজাদের সেনাপতি ছিলেন। নিজের জামাতা অনন্ত মাণিক্যকে হত্যা করে তিনি ত্রিপুর সিংহাসন দখল করেন এবং চন্দ্রপুর গ্রামে রাজপাট সরিয়ে আনেন। রাজমালার সাক্ষ্য নিম্নরূপ–

'উদয়মাণিক্য ছিল অতি অনুপাম।
চন্দ্র সাগর রাখিলেক দীঘিকার নাম॥'[৮]

(৬) বুড়ার দীঘি (১৫৭৩-১৫৭৭ খৃঃ সঃ) ঃ–

ত্রিপুরাসুন্দরীর বাড়ীর উত্তর দিকে ব্রহ্মছড়া নামক পার্বত্য জলধারা প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে সুখসাগর জলাভূমিতে পড়েছে। এই ছড়ার উত্তর দিকে উঁচু পাড়ের একটি দীঘি দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা উহাকে "বুড়ার দীঘি" বলে। রাজমালার সাক্ষ্য অনুযায়ী রণাগণ নারায়ণ উদয়মাণিক্যের ভগিনীপতি ও সেনাপতি ছিলেন। উদয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর জয়মাণিক্যের আমলে রণাগণ নারায়ণ বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজপুরুষ হয়ে উঠেন। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির সংস্কারে ও এই রণাগণ নারায়ণের ভূমিকা আছে। যথেষ্ট বৃদ্ধ এবং ইতিপূর্বে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিলেন বলে রণাগণ নারায়ণ "বুড়িয়া" বা "বুড়া" নামেও খ্যাত ছিলেন। উক্ত দীঘি খননের কাজ শুরু করেন ২য় বিজয়মাণিক্য কিন্তু তিনি শেষ করতে পারেন নি। এই দীঘি পুরাপুরি খনন করিয়ে রণাগণ নিজের নামে নামাকরণ করেন।

"এই দীঘি বিজয়মাণিক্য খনে অর্দ্ধেক।
বকচর খনি রাজা স্বর্গেতে গেলেক॥

রণাগণে পরে তাকে খনায়ে কতকে।
উৎসর্গিয়া বুড়া দীঘি নাম রাখিলেক ॥"[৯]

(৭) **অমর সাগর** (১৫৭৮-৮১ খৃঃ) ঃ–

অমরসাগর খনন করান অমর মাণিক্য বঙ্গদেশীয় জমিদারদের প্রেড়িত 'দাঁড়িদের" দিয়ে। মাটি কাটার শ্রমিকদের দাঁড়ি বলা হয়। ত্রিপুরা সামন্ত জমিদারগণ শ্রমিক দিতে বাধ্য ছিল।

পনর শ শকে অমর সাগর আরম্ভন।
তিন বর্ষে সাগর খনা হৈল সমাপন ॥"[১০]

অমর মাণিকের রাজত্বের সূচনা মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী ১৪৯৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে। ত্রিপুরা বুরঞ্জীর সাক্ষ্য অনুযায়ী এই দীঘির চারপাশে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদের বসতি ছিল।[১১] বর্তমানে আবাদ করার পর মাছ চাষ করার সুবিধার জন্য দীঘির চারপাশে অনেক পুকুর তৈরী করা হয়েছে ফলে দীঘির বিশাল আকার অনেক কমে গেছে। কাজেই অমর সাগরের বিশালতা আর মন মুগ্ধ করে না।

(৮) **রাজধর মাগিক্যের দীঘি** (১৫৮৬-৯৯ খৃঃ সঃ) ঃ–

রাজধর নগর মৌজায় অমর মাণিক্যের পুত্র কুমার রাজধর এই দীঘি খনন করান। আরাকান যুদ্ধে যাবার প্রাককালে রাজধর এই দীঘি উৎসর্গ করেন। শ্রীরাজমালার সাক্ষ্য–

"এক দীঘি খনিয়াছি রাজার আজ্ঞাতে।
কালি উৎসর্পিয়া দীঘি যাইব যুদ্ধেতে ॥[১২]"

যুদ্ধের ব্যস্ততায় রাজধরের বাহিনী পূর্বদিনেই যুদ্ধস্থল অভিমুখে ধাবিত হয় এবং রাজধর পরদিন দীঘি উৎসর্গ করে দ্রুত সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হন। বর্তমানে দীঘিটিতে বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট পুকুর তৈরী করে মাছের চাষ হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে।

(৯) **কল্যাণসাগর** (১৬২৫-১৬৬০ খৃঃ সঃ) ঃ–

দক্ষিণ চন্দ্রপুর গ্রামে কল্যাণসাগর নামে আরও একটি ছোট জলাশয় আছে। এই দীঘির পাড়ে অবস্থিত কিছু ধ্বংসাবশেষ এই দীঘির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঐ ধ্বংসস্তুপ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায় নি।

(১০) **কল্যাণ সাগর মায়ের দীঘি** (১৬২৫-১৬৬০ খৃঃ সঃ) ঃ–

ত্রিপুরাসুন্দরীর বাড়ীর পূর্বদিকে অবস্থিত এই দীঘি মায়ের দীঘি নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। এই দীঘির জলে দেবীর সেবাপূজা করা হয়। রাজমালা অনুযায়ী দেবী কালিকা কল্যাণমাণিক্যকে স্বপ্নে তাঁর জলকষ্টের কথা জানান।

"স্বপ্নে কালিকা আসি রাজাকে কহিল।
আমার নিকটে জলাশয় দিতে হৈল ॥

অতি কষ্টে আছি আমি জলের কারণে।
জলাশয় দেয় রাজা মোর সন্নিধানে ॥
* * * * *
কালিকার সমিপেত জলাশয় দিল ॥
বেদবিধি মতে উৎসর্গিল জলাশয়।
পাইল অখণ্ড পুণ্য নাহিক সংশয় ॥
পুষ্করিনি নামেরাখে কল্যাণ সাগর।
কালিকা দেবীর পূজা হৈল বহুতর ॥"[১৩]

(১১) পুরাণ দীঘি বা জগন্নাথ দীঘি ঃ (১৬৬১-১৬৭৩ খৃঃ)ঃ–

এটি উদয়পুরের অন্যতম প্রাচীন জলাশয়। এই দীঘির চার পাড়ে বিশিষ্ট প্রজাবর্গের বাস ছিল। রাজগী ত্রিপুরার উদয়পুর বিভাগীয় কার্যালয় এই দীঘির উত্তর পাড়ে স্থাপন করা হয়েছিল। দক্ষিণ পাড়ে ছিল একটি পাঠশালা যা এখনকার কিরীটবিক্রম ইষ্টিটিউশান। এই দীঘির নামাকরণ খুব সম্ভবতঃ গোবিন্দ মাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ দেবের নামানুসারে হয়েছে। জগন্নাথ দেব ভ্রাতৃভক্ত বীরপুরুষ ছিলেন, কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাজপথের পাশে অবস্থিত জগন্নাথ দীঘি তাঁরই কীর্তি।[১৪] রাজমালাতে এই দীঘি খননের ব্যাপারে কোন পদ্যপাঠ নেই।

(১২) ছত্রসাগর (১৬৬১-১৬৬৭ খৃ সঃ) ঃ–

গোবিন্দ মাণিক্যের ভাই ছত্রমাণিক্য দক্ষিণ চন্দ্রপুর গ্রামে এই দীঘি খনন করান। কুমিল্লার নিকটে ছত্রসাগর নামে আর দীঘি তিনি খনন করান। এই দীঘি যে সেই ছত্রসাগর নয়, তা বুঝাবার জন্য শ্রী রাজমালা, সাক্ষ্য–

"উদয়পুর ছত্রসাগর করিয়া খনন।
বসন্ত হইয়া রাজার হইল মরণ ॥"[১৫]

ছত্রমাণিক্যের মৃত্যু বসন্ত রোগে হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ত্রিপুরা বুরঞ্জীর মতে ছত্রমাণিক্য গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক নিহত হন।[১৬]

(১৩) রামসাগর (১৬৭৩-১৭১২)ঃ–

খিলপাড়া মৌজাতে অবস্থিত এই জলাশয় খনন করান রামমাণিক্য। রামমাণিক্য বিখ্যাত ত্রিপুর-নৃপতি গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র। রামমাণিক্য বাংলাদেশের মাইজখাড় গ্রামেও একটি বড় দীঘি খনন করান।[১৭]

(১৪) মহেন্দ্র সাগর (১৭১২-১৪ খৃঃ সঃ) ঃ–

রামসাগরের পাশেই রয়েছে আর একটি দীঘি, খনন করার মহেন্দ্র মাণিক্য। ভ্রাতৃহন্তা মহেন্দ্র মাণিক্যের শাসন কাল খুব কম। ২য় রত্নমাণিক্যকে বধ করে মহেন্দ্র রাজা হন।

এইমতে আড়াই বৎসর রাজত্ব শাসিল।
উদয়পুরে মহেন্দ্রাদি সাগর খনিল ॥"[১৮]

(১৫) **ধর্মসাগর** (১৭১৪-১৭২৯ খৃঃসৃঃ)

এটি একটি ছোট জলাশয়। মাতার বাড়ীর নিকটে "বাউস্যাপাড়ায়' ২য় ধর্মমাণিক্য এই জলাশয় খনন করান। কুমিল্লার বিখ্যাত ধর্মসাগরের সঙ্গে উহার নামে মাত্রই মিল রয়েছে। ঐ ধর্ম সাগর খনন করান ১ম ধর্মমাণিক্য "সুন্যকেষ্টহর নৈত্রে কমিতে সাকে" অর্থাৎ ১৩৮০ শকাব্দে (১৪৫৮ খৃঃ)।[১৯]

(১৬) **নানুয়ার দীঘি** (১৭১২-১৭২৯ খৃঃ সৃঃ) ঃ–

এইক্ষুদ্র জলাশয়টি খিলপাড়া মোজায় মুখসাগরের এক প্রান্তে অবস্থিত। নানুয়া বলা হত সাধারণতঃ যুবরাজের স্ত্রীকে।[২০] কিন্তু কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে–"নানুয়া ছিলেন মহারাজ ২য় ধর্মমাণিক্যের পত্নী। নানুয়া তাহার ডাক নাম। পিতামহ মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্য আদর করিয়া নাতিবৌকে নানুয়া নামে ডাকিতেন। পিতামহের পর পুত্র অভাবে পৌত্রকে সিংহাসনস্থ হইতে হইয়াছিল।"[২১] এই রাণীর আসল নাম ধর্মশালা। কুমিল্লা শহরে তাঁর নামে একটি বিখ্যাত দীঘি আছে। খুব সম্ভবতঃ রাজধানীর এই ক্ষুদ্র জলাশয়টিও তাঁরই নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

কর্ণেল মহিমচন্দ্রের উক্তিতে একটু অসংলগ্নতা লক্ষ্য করছি। রামদেব মাণিক্যের চারপুত্র ত্রিপুর সিংহাসনে বসেন তাঁহা হলেন রত্নদেব, দুর্জয়দেব, ঘনশ্যাম ও চন্দ্রমণি। রামমাণিক্যের মৃত্যুর পর পঞ্চম বর্ষীয় বালক রত্নদেব ২য় রত্নমাণিক্য নামে ত্রিপুর সিংহাসনে বসেন। সুযোগ বুঝে তার পিতৃব্য নরেন্দ্র মাণিক্য তাঁকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করেন। নরেন্দ্রমাণিক্যের পরে রত্নদেব পুণরায় ক্ষমতায় আসেন। রত্নমাণিক্যকে হত্যা করে ঘনশ্যাম ঠাকুর 'মহেন্দ্র মাণিক্য' নাম নিয়ে সিংহাসন দখল করেন। অল্পকাল পরে তাঁর মৃত্যু হলে দুর্জয় দেব 'ধর্মমাণিক্য' নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পরে চন্দ্রমণিযুবরাজ 'মুকুন্দমাণিক্য' নামে ত্রিপুরার রাজা হন। মহেন্দ্র মাণিক্য প্রকৃত পক্ষে দুর্জয়দেব বা ধর্মমাণিক্যের ভাই। শ্রী রাজমালা ত্রিপুরাবুরঞ্জী এই তথ্য সমর্থন করে। তাহলে কর্ণেল মহিমচন্দ্র কি করে ভাই কে 'পিতামহ', ভ্রাতৃবধূকে 'নাতি বৌ' করলেন তা উপলব্ধি করা গেল না।

তারিখ বিহীন জলাশয় ঃ–

কুমারীর ঢেপা ঃ

মহাদেব বাড়ী মন্দির গুচ্ছ ও গোমতী নদীর উত্তর পাড়ের উঁচু টিলার মাঝখানে অনেকগুলি জলাশয় পরস্পর নালা দ্বারা সংযুক্ত ছিল। এই দীঘিগুলি কুমারীর দীঘি নামে পরিচিত। প্রচলিত প্রবাদ এই যে এই দীঘিগুলিতে কুমারীগণ নৌকা বিহার করতেন। পরবর্তীকালে এই জলাশয়গুলি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। জঙ্গলাকীর্ণ বদ্ধ জলাশয় এই অঞ্চলে 'ঢেপা' নামে পরিচিত, ১৯৫০ সালেও ঢেপাগুলি বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে লোক সংখ্যার চাপে ঢেপাগুলি ভরাট হয়ে বসতিতে পরিণত হয়েছে।

ফুলকুমারীর জলটুঙ্গিঃ

বিজয় সাগরের পূব পাড়ের পূর্বদিকে এবং বিখ্যাত ধন্যসাগরের পশ্চিমদিকে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় ফুলকুমারীর জলটুঙ্গি নামে পরিচিত। এই জলটুঙ্গির উত্তর পাড় দিয়ে অমরপুরে যাবার প্রাচীন রাস্তা ছিল। ফুলকুমারী কে ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে 'ফুলকুমারী ছড়া', 'ফুলকুমারী ঘাট' এবং সবশেষে একটি মৌজার নামাকরণ হয়েছে 'ফুল কুমারী' নামে। উদয়পুরের আশে পাশে এরূপ নাম না জানা অনেক জলাশয় আছে। উপযুক্ত ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের অভাবে ঐগুলির নামাকরণ বা ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করা যাচ্ছে না। গকুলপুরের পরে আগরতলা-উদয়পুর সড়কের বাম পাশে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী রয়েছে। এটিই কি বিখ্যাত গোয়ালিনির দীঘি ? অথবা উদয়পুর-কাকড়াবন সড়কপথে কে. বি. আই বোর্ডিং-এর পশ্চিমদিকে রাস্তার ডানপাশের জলশয়টি, কাশীমাণিক্যের শ্মশানভূমির সংলগ্ন মজা জলাশয়টি, বর্তমান বালিকা বিদ্যালয়ের ষ্টাফ কোয়াটার্স-এর পেছনে জঙ্গলাকীর্ণ জলাশয়টি কে কখন খনন করান আমরা জানি না। এছাড়া কামারণীর পুষ্করিণী, ভট্টের পুষ্করিণী, পুরোহিতের পুষ্করিণী, মৈগ্যা দীঘি, দুধপুষ্করিণী, চন্তাই দীঘি, দাইরা দীঘি, গণকার পুষ্করীণি প্রভৃতি কত নাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সত্যিই প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর এককালে দীঘিময় ছিল এবং এখানে বাস করত নানা রকম লোক, তারা নানারকম কাজ করে রাজধানীর প্রাচুর্য বাড়াত, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল ছিল তা না হলে সেকালে এরূপ দুর্গম পার্বত্য দেশ লুটেরাদের আকর্ষণ করত কি করে ?

—ঃ পাদটীকা ঃ—

১। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২১।
২। শ্রীরামমালা, পূর্বে উল্লিখিত, দ্বিতীয় লহর, পৃঃ ১৫-১৬
৩। রমেশচন্দ্র, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪৮৯।
৪। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২১।
৫। পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৯।
৬। শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১০২।
৭। ত্রিপুরা বুরঞ্জী ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩২।
৮। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪৫-৪৬।
৯। শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয়লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৭৩।
১০। শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪।
১১। ত্রিপুরা বুরঞ্জী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩২।
১২। শ্রী রাজমালা, তৃতীয় লহর, পূর্ব্যে উল্লিখিত, পৃঃ ৩৩।
১৩। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৭০।
১৪। কৈলাস চন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, ২য় ভাগ, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ৯৪।

১৫। শ্রী রাজমালা, ৪র্থ লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৯
১৬। ত্রিপুরা বুরঞ্জী পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৩৬
১৭। কৈলাসচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, ২য় ভাগ, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ৯৪ ।
১৮। শ্রীরাজমালা, ৪র্থ লহর, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৫ ।
১৯। রাজমালা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২১ ।
২০। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২৮ ।
২১। কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্মা ঃ দেশীয় রাজ্য, ১৩৩২ ত্রিং, আগরতলা, পৃঃ ২৩০ ।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

১। সেন, কালী প্রসন্ন বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত) ঃ শ্রী রাজমালা, ১ম লহর, আগরতলা ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ।

২। " – শ্রী রাজমালা, ২য় লহর, আগরতলা, ১৩৩৭ ত্রিং।

৩। " – শ্রী রাজমালা, ৩য় লহর, আগরতলা, ১৩৪৯ ত্রিং।

৪। " – শ্রী রাজমালা, ৪র্থ লহর, অপ্রকাশিত।

৫। শিক্ষা বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার–রাজমালা, আগরতলা, ১৯৬৭ ইং।

৬। দত্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র–উদয়পুর বিবরণ, আগরতলা, ১৩৪০ ত্রিং।

৭। মজুমদার রমেশচন্দ্র–বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, কলিকাতা ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

৮। ভূঞা সূর্যকুমার–ত্রিপুরা বুরঞ্জী, গুয়াহাটি ১৯৩৮ ইং

৯। ভট্টাচার্য চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ–শিলালিপি সংগ্রহ, শিক্ষা বিভাগ, ত্রিপুরা, আগরতলা, ১৯৬৮ ইং

১০। Sarkar J. N. (Ed) : The History of Bengal, Muslim period. Patna, 1977 AD.

১১। সিহে কৈলাসচন্দ্র ঃ রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, কুমিল্লা ১৩০৩ বঙ্গাব্দ

১২। সরকার দিনেশ চন্দ্র ঃ Some Epigraphical Records of the Medieval Period from Eastern India, New Delhi, 1979.

১৩। মুখোপাধ্যায় সুখময় ঃ বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, কলিকাতা,

১৪। দেববর্মা কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র ঃ দেশীয় রাজ্য, ১৩৩২ ত্রিং, আগরতলা।

১৫। সেন ত্রিপুর ঃ ত্রিপুরা দেশের কথা, আগরতলা ১৩৭২ বাং।

১৬। শেখমনোহর ঃ গাজীনামা পুঁথি।

১৭। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ–রাজগী ত্রিপুরার প্রাচীনমন্দির প্রসঙ্গে, কলিকাতা, ১৯৮৮ ইং

নির্ঘণ্ট

অ

অর্জন দাস বৈরাগী– ৮

অনন্ত মাণিক্য– ২, ৪৮, ৭২

অমরপুর– ৫, ২২

অমর মাণিক্য– ২২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৯, ৪৩, ৭৩

অমর সাগর– ৬, ১১, ১৭, ৩১, ৪৩, ৭

আ

আখাউড়া– ২০

আগরতলা/পুরাতন আগরতলা–২, ১৯, ২৪, ২৬, ৩৪, ৩৬, ৫০, ৭২

আচরঙ্গ– ২০, ২১

আতারাম– ৬৪

আসাম– ৮, ১৮, ৩৯, ৪৩

আরাকান– ১, ৩০, ৩৯

আমতলী– ২২

ই

ইসলাম খাঁ– ৬৯

ইস্পিন্দার খাঁ– ২৪, ৩১, ৬৯

উ

উড়িষ্যা– ৬৩

উগরিহাট– ৯

ক

কমলা দেবী– ৪৬, ৭১

কমলাসাগর– ২, ২৪, ৪৬, ৭১

কলমি গড়– ২৪, ২৭, ২৯

কল্যাণসাগর– ৭৩, ৭৪

কল্যাণ মাণিক্য– ১৫, ২০, ২৪, ২৭, ৩১, ৩৯, ৪১, ৪২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৬৪, ৬৫, ৭৩

কৃষ্ণনগর– ৫

কসবা– ২৩

কমলাঙ্কনগর– ২৮

কাঁকড়াবন– ২২, ২৬, ৪৮, ৫০

কৃষ্ণমাণিক্য– ২, ৫, ২৭, ৩৩, ৩৪

কাছাড়– ২১, ৩৩

কুমজাঙ্গ– ২১

কুমারীর ঢেপা– ৭৫

কাশীচন্দ্র মাণিক্য– ৫০, ৬৬

কুমিল্লা– ২০, ২২, ২৮, ৭২, ৭৫

কৈলা গড়– ১৯, ২৪, ২৯

খ

খণ্ডল– ২৭, ২৯, ৪৮, ৭১

খলংমা– ১

খড়্গ রায়– ২৬

খাকরাই– ২১

খাসপুর– ২১

খিলপাড়া– ৬, ৭৪, ৭৫

গ

গগন খাঁ– ২৬

গামারিয়া কিল্লা– ২৪, ২৬, ২৭

গাজীর কোট– ২০, ২৮

গাজীর জাঙ্গাল– ২০, ২৮

গুণবতী– ৫৭

গোরাই মালিক– ২০, ২২, ২৮

গোমতী নদী– ৮, ৯, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ২০, ২২, ২৭, ২৮, ৪৩, ৪৮, ৬৪, ৬৬

গোয়ালগাঁও– ২২, ২৯

গোয়ালিনীর জাঙ্গাল– ২২

গৌতম মুণির চর– ৬৬

গৌড়– ৪, ৫, ১৯

ড

ডাঙ্গর ফা– ১৯, ৩৬

ডোমঘাটি– ২৬

ঢ.

ঢপলিয়া পর্বত– ৯, ১৬

ঢাকা- ৩২
চ
চণ্ডিগড় - ২০, ২৪, ২৮, ২৯, ৩৩
চন্তাই- ৯
চন্তাই দীঘি- ৭৬
চন্দ্রপুর- ২, ৩, ৬, ২০, ৬৩, ৭২
চন্দ্রসাগর- ৬৩, ৭২
চন্দ্রদর্প নারায়ণ - ২৪
চম্পক রায় - ৯, ১১
চম্পক বিজয়- ২৬
চড়িলাম - ২৬
চাকলা রোশনাবাদ- ২৭, ২৮, ৩৩
চান্দিনামুড়া- ২০
চাটিগ্রাম- ৫১, ৫৫
চৌদ্দদেবতা/ - ৯, ৩০, ৩২, ৩৬, ৪০
চতুর্দ্দশদেবতা
চুন্দল বাড়ী - ২০
চৌদ্দ গ্রাম- ২৬, ২৭
ছ
ছকড়িয়াগড় - ১৯, ২৬
ছত্রমাণিক্য/নক্ষত্র রায়- ৩২, ৪৮, ৭৪
ছোটমরি ছড়ি - ২১
জ
জগৎ মাণিক্য- ২৮, ৩২, ৩৩
জগন্নাথ দীঘি - ৫৫, ৬৩, ৬৬, ৭৪
জগন্নাথ নারায়ণ- ১৫, ৫৬, ৬১, ৭৪
জগন্নাথ পুর- ২৭
জয়নারায়ণ সেন- ৫
জয় মাণিক্য- ৭২
জামীরখাঁ গড় - ১৯, ২৪, ২৬, ২৯
জুবারফা- ১, ২, ৪, ২৬, ৩৪, ৩৬
ত
তারপাধূম- ২৪, ২৬, ৪৮
তারানগর- ২০
তিফা- ২৬, ২৭
ত্রিপুর সেন- ৮
ত্রিপুরাসুন্দরী- ১২, ২০, ৩১, ৩২, ৩৯, ৪০, ৪২, ৫০, ৬২, ৬৩, ৭২, ৭৩
ত্রিবেগ- ১
তুলামুড়া- ২৬,
তৈতৈয়া- ৩০
তেলিয়াডোঙ্গা- ১১
তৈজালপাড়া- ২১
ন
নরেন্দ্রমাণিক্য - ২৬, ২৮
নাজিরের জাঙ্গাল- ২০
প
পণ্ডিতরাজ- ৫
পিত্রা- ৬৬
পূর্ববঙ্গ- ৭
ফ
ফকীর মুড়া- ২০
ফুলকুমারী- ২, ২২, ৬১, ৭১
ব
বঙ্গদেশ- ২, ৪, ৯, ১৭, ১৮, ২২
বদর মোকাম- ৪৮, ৫০, ৬৪, ৬৫
বদর সাহেব- ৬৫
বর্মী- ১
বনমালীপুর- ৫
বরদাকান্ত নাগ- ৬১
বরচড়া- ২১
ব্রজেন্দ্র কিশোর- ৫০
বড়খাণ্ডব ঘোষ- ৫
বড়া পাথর- ২০
বড় মরিছড়ি- ২১
বলিভীম নারায়ণ- ৬১
বাগমা- ১৯, ২৪

বারদীর ব্রহ্মচারী- ৬১
বাহাদুর খাঁ- ২২
বাংলাদেশ- ৭
বিজয় মাণিক্য (২য়) - ২, ২২, ২৯, ৩৬, ৩৮, ৪৮, ৬৩, ৭২
বিজয়মাণিক্য (৩য়) - ৩৩
বিজয় সাগর- ২, ৬, ১১, ৩১, ৭২, ৭৬
বিবির বাজার- ২০
বিশালগড়- ১৯, ২০, ২৩
বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য- ২, ৫০
বুধিরাম- ৬৪

দ

দ্বিজ বঙ্গচন্দ্র- ৩৭
দ্বিতীয়া দেবী- ৬০
দুধপুষ্করিণী- ২৭
দুর্জয় সিংহ- ৯, ১৭, ৭৫
দেওগাঙ্গ- ২১
দেও পুষ্করিণী- ২০
দেওড়াই- ৩০
দেবমাণিক্য- ৩৮
দৈত্যনারায়ণ- ৩৮, ৬৩

ধ

ধন্যমাণিক্য- ২৪, ২৬, ২৮, ৩৬, ৩৮, ৪৪, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৩, ৬১, ৬২, ৭১
ধন্যসাগর- ৪৪, ৭১, ৭৬
ধ্বজনগর- ২, ৪৮
ধ্বজমাণিক্য- ৪৮, ৭২
ধ্বজমাণিক্যের দীঘি- ৭২
ধর্মমাণিক্য (১)- ৭০, ৭৫
ধর্মমাণিক্য (২)- ৮, ২০, ৩২, ৩৩, ৭৫
ধর্মনগর- ১
ধর্মশীলা- ৭৫
ধর্মসাগর- ৭৫

ম

মগ - ১, ৯, ৩০
মনতলা- ২০
মণিপুর- ২১, ৩৪
মহামাণিক্য- ৭০
মহারাণী- ৫, ২২, ৬৫
মহেশ পুষ্করিনী- ২১, ২৯
মহেন্দ্র মাণিক্য- ৭৪, ৭৫
মহেন্দ্র সাগর- ৭৪
মিজোরাম- ৩৯
মীর হাবিব- ১৬, ১৮, ৩২, ৩৩
মীর্জানুরুল্লা- ২০, ২৮, ৩১, ৬৯
মীরকাশিম- ৩৪
মুকুন্দ মাণিক্য- ৭৫
মুণ্ডমালা- ২১
মুর্শিদাবাদ - ৩২, ৩৩
মুর্শিদ কুলি খাঁন- ৩২, ৩৩
মুং- ১
মেহেরকুল- ২০, ২৪, ২৭, ২৮, ৩২, ৭০
মৈগ্যাদীঘি- ৭৬
মোহনপুর- ২০

ল

লক্ষণাবতী- ৪
লিকা- ১
লক্ষ্মীনারায়ণ - ২০, ২১

শ

শাল গড়া- ২২
শাহ সুজা- ২৪
শ্রী হট্ট- ২০, ৬৪

হ

হদ্রা- ২২
হামতারফা - ১
হীরাপুর- ৫, ২২
হৈতান খাঁ - ১৯, ২৪
হোসেন শাহ- ২৮

ভ

ভট্টশালী- ৩১
ভুবনেশ্বরী- ৫৯
ভোগজার- ২০

য

যশপুর - ৫, ১৯, ২২, ২৪, ২৮, ২৯
যশোধরমাণিক্য- ২০, ২২, ২৪, ২৮, ৩১, ৬৪

র

রণজিৎ- ২০
রণদুর্লভ নারায়ণ - ২৪
রণাগণ নারায়ণ- ৭২
রত্নকন্দলী শর্মা- ৮
রত্নপুর- ২, ৫
রত্নমাণিক্য (১) - ২, ৪, ১৯, ৩০, ৪৪
রত্নমাণিক্য (২) - ৮, ৬৩
রত্নাবতী- ৬০
রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ- ৫১
রাজনগর- ২, ৪৮
রাজার জাঙ্গাল- ২০
রাজধর মাণিক্য (১) - ২৪, ৬৪, ৭৩
রাম মাণিক্য- ১১, ১৩, ৩২, ৪৯, ৫০, ৫১, ৭৪, ৭৫
রাধাকিশোর পুর- ২, ৩
রাধাকিশোর মাণিক্য - ২, ৫০, ৫৩
রাধামাধব মন্দির- ৬৩
রামকৃষ্ণ আশ্রম- ৬৩
রাংরুঙ্গ - ২১
রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার - ২১
রায়কাচাগ - ২৪, ২৮, ৩৯
রিয়াং - ১
রোহাঙ্গিয়া - ১

স

সমসের গাজী - ২০, ২১, ২৮ ২৯, ৩৩, ৩৪
সরাইল - ১৯
সহেরবতী - ৫৬
স্বর্গদেব - ৮, ১৪, ২১
সাক্রম - ১, ৪৮, ৬৩, ৭২
সাইরেঙ্গচুক - ২১
সুখসাগর - ১২
সুজাউদ্দিন - ৩২, ৩৩
সোনামুড়া/ সোনামাটিয়া - ২০, ২৮
সোনাতলা পাথর - ২১